KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেন্স, কল-৪৫
Collection : KLMLGK	Publisher : [illegible]
Title : অন্যদিন (ANYADIN)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 24 25 26 27/1	Year of Publication : শারদ সংখ্যা ১৩৮৩ Apr - Sep 1977 Apr - Sep 1978 Apr - Jun 1979
	Condition : Brittle ✓ / Good
Editor : [illegible]	Remarks : 31 ~~and~~ to 33 Page Not Full, some Line missing (26)

C.D. Roll No. : KLMLGK

TAPAS [illegible]
67/5, Seven Tanks Estate
COSSIPORE CLUB
CALCUTTA-700002

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অন্যদিন

27/1

অবৈতনিক সম্পাদক : শিশির ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক : জীবন সরকার

অন্যাদিন প্রধানত তরুণ গোষ্ঠীর ত্রৈমাসিক কবিতাকেন্দ্রিক মুখপত্র। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক জীবনধর্মী গল্প, কবিতা ও আলোচনা সাদরে গৃহীত হবে। চিঠির উত্তর পেতে হলে অনুগ্রহ করে ডাকটিকিটযুক্ত নাম ঠিকানা লেখা খাম পাঠাবেন।

*

যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস, ক'লকাতা-৪৫
ফোন ৪৬-৩৭১৪।

*

সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন, ক'লকাতা-৬ থেকে হরিপদ পাত্র কর্তৃক মুদ্রিত ও শিশির ভট্টাচার্য কর্তৃক ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস ক'লকাতা-৪৫ থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ শিল্পী : কমল সাহা, প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ইম্প্রেশন হাউস : ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, ক'লকাতা-৯।

*

দাম : দেড় টাকা

কবি-প্রণাম সংখ্যা ১৩৮৬
সংকলন ২৭

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অন্যদিন

প্রবন্ধ

চিত্রা দেব

গল্প

সুশীল রায়, সমরেশ দাশগুপ্ত, জীবন সরকার, কালীকুমার চক্রবর্তী

রম্যরচনা

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা

অপরাজিতা গোপ্পী * আনন্দ বাগচী * অভিজিৎ ঘোষ * ঈশ্বর দত্ত * ওয়াজেদ আলি * কমল তরফদার * কমলেশ সরকার * কবিরুল ইসলাম * কল্যাণ মহাপাত্র * কৃষ্ণ ধর * কৃষ্ণসাধন নন্দী * গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় * গোপাল ভৌমিক * গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় * চিত্রভানু সরকার * তপন বন্দ্যোপাধ্যায় * তসলিমা নাসরিন * তাপস ওঝা * তাসাদ্দুক হোসেন * তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় * দিলীপকুমার কোনার * দীপক কর * নচিকেতা ভরদ্বাজ * নির্মল বসাক * প্রণব মাইতি * প্রভাতকুমার দাস * প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ * প্রফুল্ল মিশ্র * প্রেমেন্দ্র মিত্র * বিপ্লব চন্দ * বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় * বেণু দত্তরায় * মলয় সরকার * মণীন্দ্রনাথ সমাদ্দার * মঞ্জুভাষ মিত্র * মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় * মৈত্রেয়ী দেবী * রমানাথ ভট্টাচার্য * রাজকুমার বণিক * রমেন্দ্রনাথ মল্লিক * শংকরজ্যোতি দেব * শ্যামাদিত্য মজুমদার * শোভন সোম * সমরেশ মণ্ডল * সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় * সন্তোষকুমার মাজী * সন্তোষকুমার অধিকারী * সুকুমাররঞ্জন ঘোষ * হেমকুমার মুখোপাধ্যায় * শিশির ভট্টাচার্য।

বিদেশী কবিতা

আফ্রিকা

কবি আর্ডনার
অনুবাদ : অমিতাভ চক্রবর্তী

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে

ইংরাজী

শ্রীঅরবিন্দ
অনুবাদ : কানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

হিন্দী

রবীন্দ্র ভারতী
অনুবাদ : বিশ্বজিৎ সেন

আলোচনা

জীবন সরকার
পার্থ মুখোপাধ্যায়
অভিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি-পরিচিতি

বাঁকুড়া

কবিতার খবর

শোক সংবাদ

বুদ্ধদেব-কাব্যে বর্ণালী

চিত্রা দেব

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যে বর্ণবৈচিত্র্যের আধুনিকমনস্ক পাঠকের মনে হয়তো ঈষৎ বিস্ময়মিশ্রিত হতাশা সঞ্চার করবে কেননা অবচেতনার জটিল পথ ধরে আধুনিক কবির মন এমন এক সূক্ষ্ম অনুভূতির জগতে উপনীত যেখানে রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধে ভরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের কোন স্থান নেই। কিন্তু রূপ-তন্ময় বুদ্ধদেব বসুর রোম্যান্টিক কবি-কল্পনায় বিশ্বপ্রকৃতির বর্ণানুলেপন এক আশ্চর্য মায়াবী প্রতিবেশ সৃষ্টি করেছে। বহু বিতর্কিত বিদগ্ধ নাগরিক কবি হয়েও তাই তিনি বিচিত্র বর্ণসমন্বয়ে নির্মিত উপমা-চিত্রকল্পের মানসিক আনন্দের আয়োজন লক্ষ্য করতে পেরেছেন। হয়তো এর প্রেক্ষাপটে রাবীন্দ্রিক বর্ণচেতনার অলক্ষ্য প্রভাব কাজ করে থাকবে। আমরা শুধু দেখি প্রকৃতির নয়নসুখ বর্ণহিল্লোলে যখন কোন কবিতার আকাশ ভরে যায় বুদ্ধদেব বিশেষ ভাবে তার সৌন্দর্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। বক্তব্য পরিস্ফুটনে তারই সাহায্য নেওয়া যাক। জীবনানন্দ দাশের কাব্যবিচারের সময় তিনি লিখেছেন :

> "কাস্তের মতো চাঁদ, রবারের বলের মতো বুক, বরফকুচির মত স্তন এইসব উপমার উপর আমি জোর দেব না। কেননা এদের নির্ভর শুধু চোখে-দেখা বা হাতে-ছোঁয়া সাদৃশ্যের উপর, তাঁর আগে কেউ ব্যবহার করেননি বলেই এরা স্মরণীয়। আমি উল্লেখ করবো আরো আগেকার লেখা একটি পংক্তি :
>
> আঁখি যার গোধূলির মতো গোলাপি রঙিন—
>
> পড়ামাত্রেই আমাদের মনে যে নূতনত্বের চমক লাগে সেটা অচিরেই কাটিয়ে উঠে আমরা বুঝতে পারি যে এখানে ঠিক লালরঙের চোখটাকে বোঝানো হচ্ছে না, সন্ধ্যারাগের মদির আবেশের দিকেই এর লক্ষ্য, আর সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে যায় গোধূলির সঙ্গে বিবাহলগ্নের সংযোগ। 'মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন'—এটা হলো চাক্ষুষ উপমা, কিন্তু সেই আগুনই যখন 'সূর্যের আলোয় রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ' ইচ্ছার মতো হয়ে যায়

তখন শুধু ফ্যাকাশে চেহারাটাই আমরা চোখে দেখি না মনের মধ্যে নির্বাপনের বেদনা অনুভব করি।...'বলীয়ান রৌদ্র' বললে রোদ যেমন আয়তন পেয়ে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে আবার সেই রোদকেই 'কচি লেবু পাতার মতো' নরম আর সবুজ বললে তাকে দেখা যায় তখনও শিশির-শুকিয়ে-না-যাওয়া মাটির উপর সুগন্ধি হয়ে শুয়ে থাকতে।—এরই পাশে-পাশে 'পরদায় গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের স্বেদ "আর" সন্ধ্যাবেলায় জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীর "চিন্তা করলে রোদ বস্তুটাকে আমরা যেন কোন স্থাপত্যকর্মের মতো প্রদক্ষিণ করে দেখে নিতে পারি।"

[জীবনানন্দ দাশ স্মরণে/কালের পুতুল]

এখানে দেখা যাচ্ছে, জীবনানন্দ দাশের বর্ণসচেতনতা এবং কাব্যে তার সুমিত প্রয়োগ বর্ণসমাসক্ত বুদ্ধদেবের মনকে নাড়া দিয়েছে। তাঁর নিজের কবিতাতেও আমরা লক্ষ্য করি রঙ দিয়ে রূপ সৃষ্টির অক্লান্ত প্রয়াস।

"একটি ধূসর তৃণ হয়ে গেলো সজীব সবুজ"

* * *

"নিমীল উৎপলসম নত হয়ে এসেছিল নীলিম নয়ন"

* * *

"গোধূলি রয়েছে শুয়ে পশ্চিমের গোলাপি বাতিশে"

* * *

"কড়া ইলেকট্রিক আলো কাঁচা চর্বির মতো শাদা"

* * *

"চুমো খায় চোখে মেঘলা সবুজ হাওয়া"

* * *

"তাঁর শাড়ির পাড় ময়ূরের বুকের মতো নীল"

* * *

"স্বপ্নের মতো মনে পড়ে শ্যামল, সমতল শৈশবদেশ,
নীলে সোনায় মেলা মেশা, জাফরানি-বেগনিতে গলাগলি।"

এই সামান্য পংক্তিকটি থেকেই বোঝা যায় বুদ্ধদেবের কবিতার সঙ্গে রঙ কেমন ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। রঙ নির্বাচনে তাঁর অতি-সতর্ক মনোভাবের আর একটি সুন্দর ছবি আঁকা আছে 'বেহায়া' কবিতায়ঃ

"হলুদে শাড়িটা—না, না, হলুদে আলোয়
যাবে নাকো দেখা ওর রং,
লাল ?—তা বড্ড চড়া। নীল, তা-ও নয়—
খয়েরিটা মানাবে বরং!
যাকগে—শাদাই ভালো—কালো পেড়ে শাড়ি"

বুদ্ধদেব বর্ণরিক্ত শাদার মধ্যেও সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর কাব্য-গহনে আমরা যতই প্রবেশ করব ততই তাঁর বর্ণবিলাসী কবিসত্তার পরিচয় পাব।

অবশ্য বুদ্ধদেব বসুর বর্ণসচেতনতা ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারী। ভারতীয় চিন্তায় প্রকৃতির বর্ণবৈভবের একটি বিশেষ স্থান আছে। শুধু রঙে-রেখায় আঁকা ছবিতে নয় আমাদের দেবদেবীর মূর্তি পরিকল্পনায় এবং বিমূর্ত সংগীত ভাবনাতেও রঙ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় কবির মনোগঠনেও প্রকৃতির রঙ অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসতেন নীল রঙ। নীলমণি আর রক্ত করবীর রঙের মধ্যে তিনি গভীর তত্ত্বানুসন্ধান করেছেন। অনান্য রঙে ছবি আঁকতেও তিনি ক্লান্ত নন। তিনি কবিতা লিখতে বসেছেন "হাতে নিয়ে তুলি পাত্রে নিয়ে রঙ", প্রকৃতির বসন্তী চেলাঞ্চলের রঙিন আভাস প্রতি পংক্তিতে মোহিনী মায়া সৃজন করে চলেছেঃ

"শরৎলক্ষ্মী কনকমাল্যে জড়ায় মেঘের বেণী
নীলাম্বরের পটে আঁকে ছবি সুপারি গাছের শ্রেণী।...
বসি যবে বাতায়নে
কলমি শাকের পাড় দেখা যায় পুকুরের এক কোণে।
বিকেলবেলার আলো
জলে রেখা কাটে সবুজ সোনালি কালো।
ঝিলিমিলি করে আলোছায়া চুপে চুপে
চলতি হাওয়ার পায়ের চিহ্নরূপে।...
বেড়ার ওপারে মৌসুমি ফুলে রঙের স্বপ্ন বোনা
চেয়ে দেখে দেখে জানালার নাম রেখেছি 'নেত্রকোণা'।...
পাড়ার মেয়েরা জল নিতে আসে ঘাটে
সবুজ গহনে দুচোখ ডুবিয়ে সোনার সকাল কাটে।"

[উৎসর্গ কবিতা/শ্যামলী]

একটি কবিতায় এত বেশি বর্ণসম্পাত মনে পড়িয়ে দেয় অন্যত্র উচ্চারিত কবির নিজেরই উক্তি,

"রঙ ফলাইতে কবির কী আনন্দ! যেন শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। সে রঙ শুধু চিত্রপটের রঙ নহে, কবিত্বের রঙ, ভাবের রঙ আছে। অর্থাৎ কোন্ জিনিসের কী রঙ সেই বর্ণনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে হৃদয়ের অংশ আছে।"

[কাদম্বরী চিত্র/প্রাচীন সাহিত্য]

আমরা বুদ্ধদেব বসুর বর্ণ বিন্যাসেও এই 'হৃদয়ের অংশ' অনুভব করি। প্রায়ই দেখা যায় যাঁদের কবিভাবনায় বর্ণ বর্ণনামাত্র, তাঁরা মোটা রঙের প্রতি অনুরক্ত। উদাহরণতঃ সত্যেন্দ্র দত্তকে স্মরণ করতে পারি। বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের অবতারণাও অপ্রাসঙ্গিক নয়। জীবনানন্দের মতো তিনিও কবিজীবনের আরম্ভে সত্যেন্দ্র দত্তকে অনুসরণ করেছিলেন। সুতরাং সত্যেন্দ্রীয় চড়া রঙের উৎসে তাঁর আবির্ভাব বললে অত্যুক্তি হবে না হয়তো।

"বাদ্‌লা দিনের আকাশের ঐ কোলের পরে নীল পাহাড়,
সবুজ পাতার আবডালে ঐ রং খুলেছে দিলবাহার।"

প্রভৃতি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথকে মনে পড়া স্বাভাবিক কিন্তু সে খুবই স্বল্প সময়ের জন্যে। লালপরী-নীলপরী-সবুজপরী-জর্দাপরীর ফ্যান্সী জগৎ থেকে সত্যেন্দ্র-চেতনা মুক্তি পায়নি কোনদিন কিন্তু বুদ্ধদেবের কবিতা রোম্যান্টিক কল্পনালোকে উন্নীত। সত্যেন্দ্র দত্তের দু-একটি কবিতার সঙ্গে পরিণত-বুদ্ধদেবের কবিতার তুলনা করলেই এ সত্য ধরা পড়ে অবশ্য রাঙা রঙপিয়াসী সত্যেন্দ্রের সামান্য প্রভাব বুদ্ধদেবের বর্ণচেতনায় শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল বলেই মনে হয়। তবে তাঁর কবিতায় রঙ বর্ণনামাত্র নয়, তার ভূমিকা কিছু বেশি।

সত্যেন্দ্র দত্ত যখন লিখেছেন ঃ

"তার সিঁথায় রাঙা সিঁদুর দেখে
রাঙা হল রঙন ফুল,
তার সিঁদুর টিপে খয়ের টিপে
কুঁচের শাখে জাগল ভুল!
নীলাম্বরীর বাহার দেখে
রঙের ভিয়ান লাগল মেঘে,

কানে জোড়া ফুল দেখে তার
ঝুমকো জবা দোলায় দুল ;
তার সরু সিঁথার সিঁদুর মেখে
রাঙা হল রঙন ফুল।" [কিশোরী/ফুলের ফসল]

তখন বুদ্ধদেব বসু লিখছেন ঃ

"সোনার ঢেউয়ের মতো কেশরাশি উঠিছে উচ্ছ্বসি,
ঠোঁটের আরক্ত রেখা—নদীতে দীপের ছায়া সম
ভাঙ্গিয়া ছড়ায়ে যায় সারা মুখে, যখন সে হাসে।
বাদামী সে চোখ দুটি—নদীতে দীপের ছায়া সম
ভাসিয়া বেড়ায় ঘুরে—" [কখনো/কঙ্কাবতী]

প্রেমের মতো প্রকৃতির রূপদৃষ্টিতেও দুজনের ভাবনাবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সত্যেন্দ্র দত্ত ঃ

"লালে লাল পশ্চিম আকাশ—
তপ্ত সোনা—সিন্দুরে—হিঙ্গুলে,
অঙ্গে ধরি রক্ত চীনবাস
জাহ্নবী চলেছে এলোচুলে!
লাক্ষারাগে রঞ্জিত আকাশে
খণ্ডনীল দূর্বাদল শ্যাম
প্রলয়ের রক্তে যেন ভাসে
বটের পল্লব অবিরাম,—" [রূপস্নান/বেণু ও বীণা]

বুদ্ধদেব বসুর চোখে বৈকালিক শোভা ঃ

"চেয়ে দেখো কত মেঘ রঙিন মোমের মতো
জ্বলে গেলো গলে গেলো পশ্চিমের লালে
দিগন্তের আম জাম নিম
সেখানে নিবিড় নীল সেখানে পশ্চিম
লাল হলো
লাল মশালের মতো।
লাল মশালের মতো উদ্দাম রঙিন
জ্বলন্ত পশ্চিম।

চেয়ে দেখো দিগন্তের নিবিড় স্থবির নীল
হঠাৎ জঙ্গম হলো রঙিল ছায়ায়।"

[এখনো বিকেল/বিচিত্রিত মুহূর্ত]

পুনরায়,

"এমন সময় সোনা জ্বলা নদীর জলে
সূর্য ডোবালো তার টকটকে লাল গলা।
লাগলো আগুন আকাশ জুড়ে মেঘে-মেঘে
পশ্চিমে ছড়িয়ে দিলো বিয়ের রাতের রং
মেঘের উপর মেঘ চড়ালো হলদে হোলি গোলাপি বেগনি—
আহা আহা কি সুন্দর কতদিন যে এমন দেখিনি।"

[পদ্মা/বিচিত্রিত মুহূর্ত]

উভয়ের কবিতাতেই রঙের বিশেষতঃ লাল রঙের বাহুল্য রয়েছে কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ যখন বর্ণসন্ধান করেছেন বাইরের জগতে বুদ্ধদেব তখন কবিতাকে রাঙিয়ে তুলছেন হৃদয়ের রঙে, শুধু 'লাল' শব্দটির পুনরুক্তি আশ্চর্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে ; গাঢ় রঙের রেখা মোটা দাগের গণ্ডি হয়ে ওঠেনি।

(ক্রমশঃ)

প্রতিনিধি

সমরেশ দাশগুপ্ত

শৈবাল নিঃশব্দে পাখি দেখে। পাখি খাঁচায়। এই খাঁচা অনেক দিনের পুরনো। আসলে শৈবাল পাখিও দেখে না, অন্য কোন দিনের কথা ভেবে অন্য রকম হয়। স্মৃতি যেন সিগারেটের মতো, তার সুখ টান।

বৃষ্টিতে মাটি এবং গাছপালাই শুধু ধুয়ে মুছে যায় না, ভোরবেলাও। এখন যেমন। হঠাৎ জলবৃষ্টিতে মধ্যগ্রীষ্মের সকালটা কেমন ভিজে আছে। রোদ নেই, তাপ নেই এই রকম ওয়েদারে পাখিদেরও আরাম। মানুষের আরাম-টারামগুলো বড় অদ্ভুত। ছোটবেলায় সমুদ্রে-নদী এইসব ছবিতে দেখে সে ভয় পেতো, বরং ভাল লাগত পাহাড়গুলির ছবি দেখলে। শৈবাল ভাবে, মানুষের সময়গুলোকে ভাগ করে করে যদি এক একটি খাঁচায় রাখা যায়। এই রকম মনে হওয়ার পেছনে কোন দার্শনিক বোধ কাজ করে না। এমনি হঠাৎ মনে হল। এর জন্যে খাঁচাটা দায়ী। খাঁচা এবং পাখি। আমাদের বন্দী দিনযাপন। শৈবাল এতক্ষণে নিজের ভেতরটাকে পরিষ্কার দেখতে পায়। কিন্তু উপায় নেই, সে একটা সোনার খাঁচায় আটকা পড়ে গেছে।

শৈবাল যখন জার্নালিজমের ছাত্র তখন তার বাবা গত হন। মৃত্যুর দিন সকালে বাবা যথারীতি পেশেন্ট দেখেছেন, দেখেটেখে ভেতরের ঘরে ঢুকেই বললেন, শিবু (শৈবালের ডাক নাম) আজ বিকেলবেলায় একটা পাখি খাঁচা থেকে মুক্তি পাবে। ৭৫ বছর তাঁর খাঁচার জীবন। বাবা ঠিক বিকেলবেলায় দেহ রাখলেন। শৈবালের মা ওর শৈশবেই মারা যান।

শৈবালের চোখ মুখ অন্য রকম হতে থাকে। যেন অদৃশ্য কেউ এই মুহূর্তে কোন বিশাল ওজন যন্ত্রে তার ওজন নিচ্ছে। ভেতরের চিন্তা-ভাবনাগুলো পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের মতো বিচলিত থাকে। অভ্যন্তরে যুদ্ধ-বিগ্রহ। কে তাকে অবিরত বলতে থাকে, বত্রিশ বছরের স্বাস্থ্যবান সুদর্শন

শৈবাল ঘোষ, তুমি কিন্তু নিজেকে কেবল গুটিয়ে নিচ্ছ ভেতরে ভেতরে। ঘরে সুন্দরী বউ আছে তোমার, আছে একটি হাসিখুশি আমুল বেবী। তুমি বিবাহ করেছ এক চিত্র অভিনেতার কন্যাকে। তার দৌলতে খানকয়েক বাংলা বইতে সহ-নায়কের ভূমিকায় অভিনয় তো একদা করেছ। এখন তোমার সুখী পরিবার। চাকরী করছো একটি সুবৃহৎ দৈনিক পত্রিকা অফিসে। স্টাফ রিপোর্টার। ওরা তোমাকে বেশ ভালো দেয়। রেখেছে রাজার হালে।

শৈবাল সেই খাঁচা থেকে সরে আসে। ড্রেসিং-টেবলের আয়নায় নিজেকে দেখে। সুপুরুষ। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা তার কেমন করে ওঠে। কিন্তু চরিত্র নয়। আয়নার কি চরিত্র ভেসে ওঠে? মনে মনে সে নিজেকে কাগজের মতো দলামোচা করে। আসলে নিজেকে ভাঙতে চায়। নিজের সংসার। নিজের যৌবন! নিজের অস্তিত্ব। আবার সেই বিশাল ওজন যন্ত্রটা।

ড্রেসিং-টেবলে প্রসাধনী সাজসরঞ্জাম—কতো রকমের যন্ত্রপাতি যেন। প্রতিমা, শৈবালের স্ত্রী ছাড়া এগুলোতে কেউ হাত দিতে পারে না। শৈবাল একদিন সকাল বেলায় মদ্যপান করছিল। মেজাজটা বেশ একটু অন্যরকম ছিল!

—তোমার ঐ মেক-আপের জিনিসগুলো দিয়ে ছোটখাটো একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর হয়।

—আর তোমার জমানো ঐ হুইস্কীর বোতল দিয়ে? শৈবাল লজ্জা পায় নি। মত্ততায় লাজ-শরম থাকে না। এবং সে নিজের কাছে কেমন নিঃশব্দে ধরা পড়ে যায়। পড়তেই নিজেকে প্রশ্ন করে—শৈবাল ঘোষ বেশ তোফা আছো, না? অথচ তুমি ছিলে দরিদ্র ঘরের মানুষ। তোমার বাবা ছিলেন কোবরেজ। তার পশার ছিল সীমিত। দেশবিভাগের আগে ফরিদপুরের কোন পল্লীগ্রামে তাঁর ছিল প্রসারিত পশার। দেশ ভাঙতেই নিজেও ভেঙে গেলেন। দেশ ভাঙার সেই আগুনলাগা মুহূর্তে তোমার জন্ম। দেশবিভাগের যন্ত্রণা উদ্বাস্তুদের দুঃখ তাই তুমি কেমন করে বুঝবে? বাপপিতামহের ভিটা ছেড়ে চোখের জল সম্বল করে মানুষ এক প্রান্ত থেকে চলে এসেছে আরেক প্রান্তে। উদ্বাস্তু শিবির। রিফিউজি ক্যাম্প। তাদের কাছে এ এক দুঃখিত নতুন আবিষ্কার। এখন তুমি সাংবাদিক। মানুষের খবর তুমি আনতে এখানে-ওখানে যাও। এক ধনাঢ্য সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে

তোমার সংযোগ। তোমার চলাফেরা রাজকীয়। দুঃখী মানুষের রিপোর্টিং করতে যাও, মাঝপথে বিশ্রাম, খানাদানা মদ্যপান।

শৈবাল যতো নিজের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চায় ততোই তার ভেতরটা তাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে।

ভৃত্য নিতাই এসে বলে, আজ কোথায় যাবেন গো দাদাবাবু? বাইরে? শৈবাল এর উত্তর দেয় না, বলে, তুই চোখে আজকাল বড্ডো কম দেখিস।

—ক্যানে গো দাদাবাবু?

—ক্যালেন্ডারের ডেট পাল্টাতে ভুলে গেছিস।

—অ…এই কথা, আমি ভাবছিলাম কি যেন…

শৈবাল আলমারী খোলে। খুলে বোতল বার করে।

নিতাই নাক কুঁচকে বলে, আবার সক্কাল বেলায় ঐ গুলান…

শৈবালের মনে হয় আসলে আমাদের সময় কেটে যায় শুধু দুবেলা কৈফিয়ৎ দিতে দিতে মানুষের অস্তিত্বের ওঠানামাই এই জন্যে দায়ী। মদ আমার কাছে জল-ভাত। কিন্ত, প্রতিমাও আজকাল মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করে। শৈবাল তখন কড়া গলায় বলে, তোমার বাবা যে একটা মদের পিপে।

—তার সঙ্গে তোমার তুলনা করো না। তিনি শিল্পস্রষ্টা। তুমি কি?

—সংবাদস্রষ্টা।

—ছাই স্রষ্টা। তাও যদি তোমায় স্বাধীনতা থাকতো। সৎ হতে। টাকাওয়ালা কাগজের গোলাম। নিরাপত্তা না ছাই!

—তাহলে চাকরীটা ছেড়ে দিই? ফুটপাথে একটা দোকান খুলি? তখন দেখবো তোমার সাজসজ্জার বাহাদুরী কেমন বজায় থাকে।

—তখন সাজবো না। মিলের কম দামী শাড়ী পরবো। তুলসীতলায় প্রদীপ দেখাবো। এখন এসব করলে তোমার জাত যাবে না?

গ্লাসে রঙিন পানীয় জমছে—আবার ফুরিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? শৈবালকে করে তুলছে নষ্ট ফলের মতো শিথিল। খাঁচায় পাখিটা ডেকে চলেছে। এই বিশাল শহরে বড় বড় গাছ কোথায়? পাখিরা এখন ঘরে বাসা বাঁধে। কে বলছিল পাখিদের সংখ্যা নাকি ক্রমশ কমে যাচ্ছে? ওরাও কি নাগরিক যন্ত্রণায় উদ্বাস্তু হচ্ছে? স্বাধীনতার ত্রিশ বছর বাদে আজো কাটেনি উদ্বাস্তু জ্বালা। ছিন্নমূল মানুষগুলো এখনো ঘর খুঁজছে। শৈবাল অস্থির হয়। বিচলিত হয়। বাবাকে মনে পড়ে, দুঃখিনী পূর্ব-

বাংলাকে। সে উঠে দাঁড়ায়—চীৎকার করে কাকে অভিশাপ দিতে যায়, পারে না। পকেটে আছে কার্ডটা—তাকে সুখী করার কার্ড। যে কার্ড তার সব স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে বলছে—কাশ্মীর যাবি? সামনের মাসে—চাকরী ছাড়তে চাইছিস কেন? এ্যাতো টাকা কি কেউ তোকে দিতে পারবে? তোর আরো টাকা চাই? এই বিশাল সংবাদপত্রের তুই একজন স্টাফ রিপোর্টার—তোর দেওয়া নিউজ পড়ে পথে-ঘাটে কতো কথার ঝড় বয়ে যায়। আমাদের কাগজকে লোকে ভাড়াটে কাগজ বলে নিন্দে করে? করুক না। আড়ালে তোকে দালাল বলে লোকে? বলুক না। আসলে এইখানে তুই সুখী রাজপুত্র। এই সুখের সাম্রাজ্য ছেড়ে কোথায় যাবি? কে দেবে তোকে এত নিরাপত্তার আশ্বাস।

কোথায় যাবি তুই? তোর হাত ভালো আছে। তোকে আমরা সাহিত্যিক হিসাবেও খ্যাতিমান করবো। তোর ওঠা নামাতো আমাদের হাতেই।

ভারসাম্য হারাতে হারাতে শৈবাল ক্রমশঃ তলিয়ে যেতে থাকে। সে খাটের নীচে ঢুকতে থাকে। নিতাই এসে বাধা দেয়—কি করছ্যান গো দাদাবাবু? অ দাদাবাবু?

—আঃ তুই থাম দেখি—ঐ খাটের নীচে আমার ছোটবেলার জুতো লুকনো আছে—

—ঐ সব ময়লা থেকে সরে এসো দেখি।

—আমার দুচোখে অনেক জল আছে—সব ময়লা আমি ধুয়ে দেবো। কিন্তু ছোটবেলার জুতো আমার চাই!

নিতাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাইরে চলে যায়। দাদাবাবু এখন অন্যজগতে।

শৈবাল এখন রাজপথে। দিব্যি ফিটফাট। মুখে সিগারেট। যেন বাংলা ছবির নায়কের মতো। সিনেমা হলের সামনে শীলার সঙ্গে দেখা হয়। কথাবার্তা হয়। এখন ও হাসপাতালের নার্স। কথায় কথায় বলে, আমাদের হাসপাতালে গলদের শেষ নেই। তুমি তো বড় কাগজে আছো, সব ফ্ল্যাশ করে দাও না।

—বড় কাগজে বড় সংবাদ ছাপা হয়।

—ছাই হয়, শুধু বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। হাসপাতালের গলদের চেয়ে এক পাতার শাড়ীর বিজ্ঞাপন ছাপলে তোমাদের অনেক লাভ। তাই না?

—লাভই তো। ব্যবসা করতে বসে কেউ লোকসান চায় না।

—বিজ্ঞাপন দিয়ে নিউজের জন্য বরাদ্দ নিউজপ্রিন্ট চিবিয়ে খেতে খুব ভালো লাগে, না?

—যাক গে ওসব কথা। তোমার মা এখন কেমন, মাসীমা?

—আমাদের গরীবদের খবরে তোমার কি এসে যায়?

—যেহেতু আমি রিপোর্টার। সংবাদ সংগ্রহ আমার কাজ।

—সেতো দেখতেই পাচ্ছি, আঙুলে ঝিকমিক করছে হীরের আংটি! এই নিয়ে বস্তিতে যাও খবর আনতে।

এমনিভাবে কাটাকাটা কথা চলতে থাকে। একসময় তাও ছিঁড়ে যায়। ছেঁড়ার আগে শৈবাল শীলাকে ওর ভিজিটিং কার্ড দেয়। দামী কার্ড। দামী ছাপা। শৈবাল ওর বাসার টেলিফোন নাম্বারটা হাতে লিখে বসিয়ে দেয়। শীলা মনে ভাবে, হায় এসটাব্লিশমেণ্ট মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়।

তারপর সে হাসপাতালে যায়। তার ছোটবেলার বন্ধুকে দেখতে। নির্মাল্যের পেটে স্টোন। অপারেশন হবে।

নির্মাল্য শৈবালকে দেখে মুখ বিকৃত করে। তার ভেতর মুচড়ে ওঠে সামান্য তিক্ত হাসি।

—কি রে আজ কেমন?

—আমি মরলে তোর কি এসে যায়? বরং অসুস্থ কোন শিল্পপতির খবর কাগজে দিবি, কাজ হবে।

—অভিমানের কথা?

—না, বেদনার কথা। পুঁজিপতিরা অসুস্থ হয়ে পড়লে দেশের পক্ষে অমঙ্গল নয়?

—কি ব্যাপার বল তো? আজ বৌদি আসেন নি বুঝি ভিজিটিং আওয়ার্সে?

—তার বি-শিফট ডিউটি।

—তাই বুঝি আজি রজনীতে হয়েছ উতল···

—খুব যে ফুর্তি? ক' পেগ হয়েছে সকাল থেকে শুনি?

—পেগের হিসেব নয়, বোতলের হিসেব পারি।

—আশ্চর্য, যে দেশের মানুষ দুবেলা খেতে পায় না ভালো করে—সে দেশের কেউ কেউ আবার মদের স্বর্গেও বাস করে? এ্যাতো টাকা আসে কোত্থেকে তোর?

—কালো টাকা।

—কে দেয়?

—কালো মাণিক।

—তোদের কাগজের মালিকের কথা আর বলিসনে। ঘেন্না ধরে যায়। এর চেয়ে বেশ্যাবৃত্তিও ভালো।

—অপারেশন ডেট কবে দিয়েছে তোর?

—খবর রাখি না।

—কি খবর রাখিস তাহলে?

—খবর রাখি খবরের কাগজে আবার উদ্বাস্তু খবর বেরুচ্ছে। আসলে আমরা দিন দিন সবাই ছিন্নমূল হয়ে যাচ্ছি। প্রতি মুহূর্তেই হচ্ছি চক্রান্তের শিকার। বিচ্ছিন্নতার শিকার।

দুই বন্ধু কিছুক্ষণ হাসপাতালের মাপা কথাবার্তা অষুধের গন্ধ ইত্যাদির মাঝে ডুবে থাকে। এক সময় শৈবাল চলে আসে। তার বুকের ভেতরে বুঝি এক ব্যাটালিয়ান সোলজার মার্চ করে। শীলার কথাগুলো, বন্ধুর কথাবার্তা তাকে বিচলিত করে। সে তৃষ্ণার্ত হয়। মদ নয়, তার এখন আকণ্ঠ পুরে পুকুরের ঠাণ্ডা জল খেতে ইচ্ছে করছে। আর কি সেই যোগাযোগ, ছায়া ছায়া পুকুরপাড়ে যাওয়া যাবে?

এখন অফিসের পিঞ্জরে সে নিজেকে নিঃশব্দ সঁপে দেয়। খবর নিয়ে জানে তাকে উদ্বাস্তু সংবাদ আনতে হাসনাবাদ যেতে হবে। বড় কঠিন কাজ। ছিন্নমূল দরিদ্র মানুষগুলোর মাঝে নিজেকে বেশীক্ষণ রাখা সহজ নয়। তাদের জ্বালা দুঃখ যন্ত্রণা চোখের জল তার সৌখীন জীবনযাত্রাকে উপহাস করবে। বন্ধুবান্ধবরা শৈবালকে বলে, তোদের কাগজ তো সি-আই-এর টাকা খায়। জঘন্য দালালী বৃত্তি। গোপনে ঘা বাড়িয়ে দিয়ে প্রকাশ্যে মলম নিয়ে ছোটা! ভেতরে ভেতরে অপসংস্কৃতির বীজ ছড়ানো। উদ্বাস্তু-স্রোত শৈবালকে স্তব্ধ করে দেয়। অপরাধবোধ তার অত্যন্ত স্মার্ট সাজ-সজ্জাকে ধাক্কা দেয় বারবার। নিজেকে মনে হয় নীলবর্ণ শৃগালের মতো। মনে পড়ে বাবার মুখটা। বলতেন, দেশ ছাড়ার যন্ত্রণা তোরা কি বুঝবি রে? ভেতরে ভেতরে একটা অপরাধবোধ। তাই যন্ত্রণা। তাই শৈবাল ভয় পেয়ে যায়। তার দুই পা দামী ট্রাউজারের আড়ালে কাঁপে। সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় গোপন কক্ষে।

—আমি বড় ক্লান্ত।

—কেন?

—কাল গিয়েছিলাম পুরুলিয়ার খরা এলাকার নিউজ কভারেজে, তাই টায়ার্ড।

—এটা মিথ্যা কথা।

—আপনি তো আমাকে জানেন স্যার…(আপনার আত্মজীবনী আমার হাতে লেখা, শৈবালের স্বগতোক্তি…)

—রিফিউজিদের ফেস করতে চাইছো না তাহলে?

সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার তোলে মালিক পক্ষের গোপন হাত। কি সব কথাবার্তা হয়। বুঝিবা সাংকেতিক ভাষায়।

—ঠিক আছে ওটা ক্যানসেল হয়ে গেল। তুমি ডিপার্টমেন্টে যাও, ডিউটি পাবে।

—কোথায়?

শৈবাল জেনে যায়। উড়িষ্যার কোনারক মন্দিরে নৃত্যসভার সংবাদ আনতে হবে। এ বেশ ভালো হল। ময়লা ছেঁড়া চোখের জল নয় ওখানে নারীর যৌবন…সুখ…তৃপ্তি। এক সময় সমুদ্রকেও ছুঁয়ে আসা যাবে।

যাও, আজ রাত্রের ট্রেনেই।

শৈবাল ঘোষ, তুমি পালাও। যতো শীঘ্র সম্ভব। উদ্বাস্তুরা যেখানে আছে থাকুক তুমি নর্তকীদের শরীর জরিপ করো। তারপর কলামের পর কলাম ভরিয়ে দাও।

চলতি ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাশ কম্পার্টমেন্টে শৈবাল এখন নিজের অস্তিত্বের মুখোমুখি। তুমি উদ্বাস্তুদের সম্মুখীন হতে ভয় পেলে নাকি? নৃত্য-সভার দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছো। গেলে কি হবে, আসলে তুমি আত্ম-প্রতারণার খেলা খেলছ। এর আগে কোলকাতার ক্যাবারে নর্তকীদের নিয়ে কি বিশ্রী ভঙ্গিতে কলাম পূরণ করেছ!

যে বিশাল দুর্গের সঙ্গে তোমার জীবিকার শেকল বাঁধা তারা তোমাকে উঠতে-বসতে সুখী রাজপুত্রের মর্যাদা দিচ্ছে। তাদের সংবাদ সরবরাহ-নীতি তোমার জানা আছে—তোমাকে সেইমতো চলতে হয়। তুমি সোনার খাঁচায় আটকা পড়ে গেছো। বেরুতে পারবে কোনদিন? ওটা হল মানুষ ভাঙার কারিগর।

গাড়ির চাকার শব্দে তীব্র উচ্চারণ জড়িয়ে ছড়িয়ে যায়।

—ওরা আমাকে সুখ দেয়, ওদের কি ছাড়তে পারি? বরং আমাকে কলেজের অধ্যাপনার চাকরী ছাড়িয়ে এখানে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

—আর সেই সঙ্গে কিনেও নিয়েছে। প্রতিশ্রুতির নানা রঙের ফানুস তোমার সামনে ওড়ায় নি ওরা? বলেনি এই পত্রিকার মাধ্যমেই তুমি শুধু সাংবাদিক নও, লেখক হিসাবেও বাংলাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রতিষ্ঠা! আশ্চর্য! ওদের নির্দেশে তোমার কলম কোথায় যায় জানি। চাইবাসার অরণ্যে কোন আদিবাসী রমণীর সঙ্গে সঙ্গম করে বাইরে সেটা বড় গলায় জাহির করো। আর পত্রিকা তোমাকে ঘন ঘন তাগাদা দিচ্ছে ঐ শরীর নিয়ে খেলার পটভূমিতে একটা বেশ রক্ত মাতাল করা উপন্যাস দেওয়ার জন্যে। ওরা তোমাকে বলে, চতুর্দিকে আত্মকেন্দ্রিকতার বীজ ছড়িয়ে দাও।

তুমি যে কলেজে ছিলে, নির্মাল্য দত্ত এখনো সেখানে কাজ করে। সে আজো আদর্শ বজায় রেখে সৎ আছে। যদিও অসুস্থ। তাকে তুমি বলোনি? —চলে আয় আমাদের কাছে, সুখ পাবি। ঠিকমতো চিকিৎসা পাবি।

—মৃত্যুকে বন্ধক রেখে সুখ পেতে আমি চাইনে। নির্মাল্য জবাব দেয়নি?

এখনো তুমি কোন্ সাহসে শীলার কাছে মুখ দেখাও? যৌবনের খেলার নাম করে তার সর্বনাশ তুমি করোনি? একদিন বলোনি ওকে, দেশ বিভাগ হয়েছিল বলে তোমরা বেঁচে গেলে। তোমাদের উচিত জিন্নাসাহেব আর র‍্যাডক্লিফ সাহেবকে পুজো করা। ছিঃ, এই তোমার বুদ্ধিজীবিতার বহর? কেবলই সামনের দিকে টগবগ করে ছুটে যাচ্ছো। আসলে তুমি কিন্তু পেছনের দিকে এগিয়ে আছো। তোমার অস্তিত্ব হারিয়ে যায় প্রতি পদক্ষেপে। আজ নাকি তুমি সুখী রাজপুত্র।

মহান রাজপুত্তুর, একবার দয়া করে পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখুন তো, সামনের দিকটাও। কি দেখছেন? উদ্বাস্তু মিছিল?

কি হ'ল ভয় করছে? ঐ মিছিলে আপনিও তো আছেন। টের পাচ্ছ না ওরা তোমাকে রাজত্ব দিয়েও শরণার্থী বানিয়ে রেখেছে। সুস্থ মানসিক ভূখণ্ড থেকে তোমাকে বাস্তুচ্যুত করে রেখেছে। এই চলমান প্রথম শ্রেণীর চার দেয়ালের ভেতর তুমি আজ তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করছো।

ট্রেন যতো দ্রুতগামী হয় শৈবাল নামক মানুষটি ততো মনে মনে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে থাকে। আজ তার স্ত্রী যার নাম প্রতিমা, অন্তঃসত্তা। জঠরে মাংসপিণ্ড রূপ নিতে থাকে। এই নবজাতকের জন্যও কি তৈরী হচ্ছে রিফিউজি ক্যাম্প?

হে সুখী রাজপুত্র, খরস্রোত সময়ের কাছে জেনে নাও সেই উত্তর পুরুষ সময়কালে কার প্রতিনিধিত্ব করবে।

জন্মকালে নবজাতকের কান্না শুনে তোমার উপলব্ধি করা দরকার, সে বলছে: আমাকে উদ্বাস্তু করো না। শুধু দাও সুস্থ মানুষের প্রতিনিধিত্ব॥

কোকিল কণ্ঠ

সুনীল রায়

মাঝরাতে কোকিলটা চ্যাঁচায়। গলা ভেঙে গিয়েছে চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে। তাই বড়ই কর্কশ লাগে আওয়াজটা।

পাকা-গাইয়ের গান পছন্দ করি বলে তার হাতে হাতকড়া দিয়ে বন্দী করে তাকে নিজস্ব সম্পত্তি করে নিলে যেমন হয়, এও বুঝি তেমনি। কোকিলটা বাঁধা হয়েছে খাঁচায়। সে তাই আর ডাকে না। সে কাঁদে। বড় কর্কশ লাগে তার ঐ গলা।

বসন্তকালটাই তার প্রাণের আরাম! গলা ছেড়ে দিয়ে সে তখন মনের আনন্দে গান করবে—এই তার ইচ্ছে, এই তার স্বভাব। কিন্তু তার জীবনের এবারের বসন্তটা বিফলে গেল। বিলাসীদের পিতলের খাঁচায় সে ধরা পড়ে গিয়েছে।

গলাও ধরে গিয়েছে তাই তার। তাই গলাটা এমন কর্কশ শোনাচ্ছে।

কাককে ধরে বেঁধেও কোকিলের মত ডাকানো বুঝি যায় না। কিন্তু কোকিলের গলা কেমন চমৎকারভাবে ঝাঁঝালো করে দেওয়া গিয়েছে।

যারা কোকিলকে খাঁচায় পুরতে পারে তারা হরিণকেও বুঝি রাখতে পারে আড়গড়ায়, তারা গোলাপফুলের ব্যাসমভাজাও বুঝি খেতে পারে তারিয়ে তারিয়ে।

এ কাজ যারা পারে তাদের রুচির তারিফ করি, তাদের বিলাসকে বাহবা দিই। তাদের শক্তি দেখে ধন্য ধন্য করি।

কিন্তু কোকিলটার দশা দেখে আক্ষেপ না করে পারিনে।

যে-পাখির গলা শোনার জন্যে কান পেতে জেগে জেগে শুয়ে রাত কাটিয়েছি, সেই পাখির ডাক কানে আসবে ভেবে এখন দরজার কপাট আঁটি, এই গরমেও জানালা বন্ধ করে দিই।

একটা কোকিল ডাকত আমাদের এই অঞ্চলে। মাঝরাতেও সে ডেকেছে অনেক বার। বছরের নিয়মিত একটা সময়ে তার ডাক শোনার জন্যে ব্যাকুল

হতাশ। শীতের পরে বাতাসে যখন বসন্তের আমেজ লাগত এবং গভীর রাত ভরে যেত চাঁদের আলোয়, তখন সেই কাকজ্যোৎস্নায় জেগে উঠত কোকিল। কিছুটা দূরের গাছে বসে সে গলা ছেড়ে ডেকে উঠত—কুউ কুউউ।

চোখ বুজে শুয়ে-শুয়ে মনে মনে তারিফ করতাম ঐ গলার। গলায় একটা দানা নেই, স্বরটা কী চমৎকার মসৃণ বলে ঠেকত। কোনো কোকিল-কণ্ঠীর কথা তখন মনে হত কিনা, সে কথা এখন থাক্।

কিন্তু সেই আমি আজ এ কী হলাম। কোকিলের গলা শোনার ভয়ে আমি কেবল দরজা-জানালাই নয়, দমও যেন বন্ধ করেছি।

আমার প্রতিবেশী কোকিলটি কেঁদে ওঠে মাঝরাতে। গলায় কাৎরানি নেই, যেন আর্তনাদ করে ও। ভাবি, বুঝি ওর গরম লেগেছে।

ঘেমে উঠি আমি। হাতপাখা চালাই। সামনের মাঠের তালগাছ দুটি ঝাঁকড়া চুলের মাথা একটু-একটু আন্দোলিত করে, এবং ভুতুড়ে দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে তামাশা দেখে।

এই কোকিলের দশায় আমি একটুও দুঃখিত নই। আমি আমার নিজের দশা নিয়েই ব্যস্ত। কাকের ডাক শুনে যে শিউরে ওঠে না, কোকিলের গলা শুনে তার মর্মাহত হওয়াটা বাড়াবাড়ি হয় যদি তা হোক।

নিজেকে গাল দিয়েও নিজেকে ঠাণ্ডা করতে পারিনে। এপাশ-ওপাশ করি। পিঠ দিয়ে ঘাম গড়িয়ে নামে, শিরশির করে ওঠে শরীর। এমন গরমে অতিষ্ঠ হওয়া স্বাভাবিক, নিজেকে ঠাণ্ডা করা সত্যিই দায়।

এরই মধ্যে একটু সান্ত্বনা হয়তো পাওয়া যেত, যদি সেই পুরনো কোকিলটা তার নির্ভেজাল গলায় একটু খাঁটি ডাক ডাকত। কিন্তু তার বদলে ডেকে উঠল পিতলের খাঁচার বন্দী পাখিটা। সেই আর্তনাদ শুনে হিম হয়ে গেল শরীর।

নিজেকে ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু হিম হয়ে গেলাম। আরাম পেলাম না।

কী বলছে ঐ পাখিটা? কাউকে গাল দিচ্ছে, না, নিজেকেই ভর্ৎসনা করছে?

ও-পাখির ভাষা বুঝিনে। ও-ভাষা বুঝতে হলে নিজেকে পুরতে হবে ঐ পিঁজরায়, বসতে হবে গিয়ে ঐ পিতলের দাঁড়ে।

কিন্তু সে সৌভাগ্য চাইনে বলে দিনের বেলা বসেছি এই খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে চিৎ হয়ে। রাত্রের দুঃস্বপ্নটা চোখ থেকে মুছে ফেলার জন্যে মুক্ত আকাশটার দিকে চেয়ে আছি। গাঢ় নীলে যেন ছুপিয়ে আনা হয়েছে আকাশটাকে এইমাত্র। রং একেবারে টাটকা, কোথাও একটু দাগ পড়েনি।

এই অবারিত আকাশ যার চলে বেড়াবার জন্যে উন্মুক্ত ময়দানের মত পড়ে আছে সেই চোখ-দুটোকে ভিজে তোয়ালে দিয়ে ঢাকা দিয়ে নিলাম। রোদের তাতে জ্বালা করছিল চোখ। অনেকক্ষণ এইভাবে চোখ-দুটোকে বন্দী করে বসে আছি, কত সময় কেটে গিয়েছে হিসেব করিনি। হয়তো সেই অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। কোকিলের কণ্ঠসংগীতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে রাত্রে ঘুম হয় নি, তার পরেই এই ছুটির দিন পেয়ে দিনের আলো ব্যর্থ করে দিয়ে আকাশের নীল উপেক্ষা ক'রে চোখ-দুটি বুজে গিয়েছিল তোয়ালের আড়ালে।

চোখ থেকে যখন তোয়ালে সরালাম তখন বিকেল। আকাশের নীল একটু ঘন হয়েছে। রোদের তাতে নাকি রঙ নষ্ট হয়। রঙিন জামা-কাপড় কড়া রোদে এই জন্যেই বুঝি মেলে দিতে নেই। কারও জামা-কাপড়ের রঙ চটেছে কিনা জানিনে। কিন্তু আকাশের বর্ণটা একটু তেজীই হয়েছে। তাতে কিন্তু ক্ষতি হয়নি মোটেই। রঙ গাঢ় হওয়ায় আকাশের চেহারা বরঞ্চ একটু খোলতাই দেখাচ্ছে।

সারাটা দিন গেল, আমার প্রতিবেশী বন্দী বিহঙ্গটি একবারও ডাকল না। দিনের আলোয় সে দুনিয়া দেখে। সে দেখে—ঘুলঘুলিতে ঢুকছে আবার চট করে পালিয়ে যাচ্ছে চড়ুই; সে দেখছে—একজোড়া টুনটুনি টেলিগ্রাফের তারের উপর বসে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে; সে দেখছে—আকাশে দ্বিতীয় বন্ধনী এঁকে-এঁকে পাখা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে চিল। সে দেখছে—ডাস্টবিনে মুখ ডুবিয়ে কী যেন চুরি করেই পালিয়ে যাচ্ছে কাক; সে দেখছে ঐ কাক লাফিয়ে এসে বসেছে বালতির কানায়, শানের উপর বালতি পড়ে ঝনঝন শব্দ করে দুপুরের শান্তি দিচ্ছে খান-খান করে!

সারাদিনের এই জীবনযাপনের রঙ্গ দেখে সে একদৃষ্টে, তার খাঁচার গরাদের ফাঁক দিয়ে! রাত্রিবেলা দিনের এই স্মৃতিরা কণ্টের বেশে এসে তার গলা চেপে ধরে। আর্তনাদ করে ওঠে সে। হয়তো চিৎকার করে ওঠে যন্ত্রণায়।

সেই যন্ত্রণার ভাগ পাই আমিও। আমাকে পেতে হয় কেননা আমি তার প্রতিবেশী।

রাত্রের সেই যন্ত্রণার পরে, এখন এই বিকেলে বসে আছি খোলা বারান্দায় চিৎ হয়ে, গা এলিয়ে দিয়ে।

গাঢ় নীল আকাশ দেখে ইচ্ছে হচ্ছে, পাখিটা যদি পেত এখন ঐ আকাশের স্বাদ, যদি ঐ আকাশের রেণু সে মেখে নিতে পারত তার ডানায়, তাহলে ফিরে আসত বুঝি তার গলার গান। তাহলে তার গলা শোনার জন্যে কাকজ্যোৎস্নার রাত্রে বুঝি জেগে থাকতাম উৎকণ্ঠিত আনন্দ নিয়ে।

আনন্দ পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলাম বলেই বুঝি মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগল। হঠাৎ দেখি আমার চোখের সম্মুখে জেগে উঠেছে অকৃত্রিম আনন্দের চলন্ত চিত্র।—সারা গায়ে রোদের মিছিল দেখে নিয়ে নীল আকাশে আলপনা এঁকে উড়ে চলেছে একঝাঁক বক। তাদের সারা শরীর দিয়ে তারা চিত্রিত করে তুলেছে ঐ নীলের অঙ্গ! তৃষ্ণার জন্যে আর তৃণের জন্যে অনেক দূরে গিয়েছিল হয়তো তারা, দিনের শেষে দল বেঁধে আকাশ পাড়ি দিয়ে তারা এখন ফিরছে নিজেদের ডেরায়।

এটা সাধারণ কাজ, গতানুগতিক জীবনের একটা অধ্যায় মাত্র। দিনের কাজ সেরে ঘরে না-ফেরে কে? কিন্তু সেই সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে এমন অসামান্য আনন্দ জোগাতে বুঝি সকলে পারে না।

দুরন্ত মধ্যাহ্নের নিদারুণ তাপ সহসা ভুলে গেলাম। মনে হল, মন্দ না এই গরম কালটা। এখন উত্তপ্ত আকাশেও চালচিত্র আঁকা যায়, চলচ্চিত্র ফুটে ওঠে তাহলে। বকেরা যখন একত্র হয় তখনই তারা ছবি আঁকে; কিন্তু যখন তারা একা একা তখন বুঝি নিছক এক নয়, তখন তারা বকধার্মিক। জলার কিনারে এক-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এরা যখন ধ্যান করে, তখনই সে-ধ্যানে সন্দেহ জাগে। রোদের তাতে জলা শুকিয়ে উঠেছে, নীল ফুলের পাপড়ি গিয়েছে চুপসে, তার গোল-গোল পাতা গিয়েছে কুঁকড়ে, জলার এই দুর্দশার কথা না ভেবে বসে বক গিয়ে বসে একটা মতলব নিয়ে।

সেই বকই আবার যখন আলপনা এঁকে আকাশ পাড়ি দেয় তখন তার বিরুদ্ধে আর কোনো নালিশ থাকে না। তখন তাকে বকধার্মিক না-বলে বলতে ইচ্ছে যায় রসশিল্পী। ঘরে ফিরতে গিয়ে নিজেদের অজানিতেই চিত্ররচনা করে তারা।

আমার মনের কথাটি কেউ বুঝে থাকবে, আকাশের দিকে অমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে অনেকের হাসি পেতে পারে। সেই হাসি শুনলাম। এবং সেই সঙ্গে শুনলাম কথাও। শুনলাম "দিনের কাজ শেষ করে ঘরে ফিরতে গিয়ে চিত্ররচনা আরও অনেকে করে। টাটকা কথাটা মনে নেই? কালই তো গেছে শনিবার। দুপুর রোদে বাড়ি ফিরতে গিয়ে কী কাণ্ডটাই হল। পাঁচ গলে আলকাৎরা হয়ে গেল রাস্তাটা, সেই আঠায় আটকে তো গেলই চটিটা, সারা কোঁচাটা পাঁচে মাখামাখি—যে ছবি আঁকা হয়েছে ঐ কাপড়ে তা মুছতে আমার প্রাণান্ত। চটি সাফ করতেও—"

ওসব কথা শুনতে আর ভালো লাগল না। ইজিচেয়ারের আরাম ছেড়ে উঠে পড়লাম। ও কণ্ঠসংগীত আর শুনতে ইচ্ছে হল না। আরামে বসে নির্বিবাদে কবিত্ব করাটা এভাবে মাটি হবে বুঝিনি। কিন্তু ইতিমধ্যে বকের পাঁতি পালিয়েছে, দূরের ঐ গাছের আড়ালে চলে গিয়েছে তারা। আমিও বাইরে বেরিয়ে গেলাম।

ঐ বন্দী বিহঙ্গটিও নিশ্চয় তার খাঁচায় বসে আমারই মত দেখেছে ঐ চলচ্চিত্র। হয়তো মুগ্ধ হয়েছে সেও, হয়তো সেও তারিফ করেছে ঐ পরম রমণীয় দৃশ্যটার।

কিন্তু কেউ তার সেই কবিত্ব ভাঙবার জন্যে তার খাঁচার আরামকেদারা থেকে তাকে তুলে বাইরে বের করে দিচ্ছে না—কেন তাই ভাবি।

পাখিটার বুঝি তেমন কোনো সহায় নেই।

নিশ্চয়ই নেই। আজ রাত্রেও সে অসহায়ের মতন কেঁদেছে। ভাঙা গলায়। ঘুমুতে পারিনি। পিপাসা পেয়েছে। উঠে জল গড়াতে গিয়ে দেখি কুঁজোটারও গলা ভাঙা। কিন্তু তাতে অসুবিধে হয় নি। জল রীতিমত ঠাণ্ডাই পেয়েছি। আকণ্ঠ সেই জল পান করলাম।

বন্দী পাখীটার গলায় এই জল একটু ঢেলে দিলে বুঝি সেও আরাম পাবে। না, তার প্রাণের আরাম জল নয়—আকাশে।

বাঁচার খেলা

কালীকুমার চক্রবর্তী

গত রাত থেকেই মেজাজ খিঁচড়ে আছে অমরের। তিরিক্ষি। রঞ্জুর এক কথাতেই আগুন ধরে গিয়েছিল রক্তে। জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল গা। সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠেছিল—দত্তবাবুদের কথা আমাকে শোনাবে না রঞ্জু।

—তাহলে কি শোনাবো? মিষ্টি মিষ্টি কথা?

—সে তো পারবে না জানি তবে নিঃশ্বাস ফেলবে না একদম।

—নিঃশ্বাস কোথায়? দত্ত গিন্নীকে স্পেশালিস্ট দেখানো হচ্ছে বলেছি। এর মধ্যে নিঃশ্বাসের কি আছে?

—অর্থাৎ আমি পারলাম না, তাই না?

—আজ পর্যন্ত কি পেরেছো বলতো? শুধু বৌ ঠেঙিয়েই গেলে।

—কি বললে? আমি বৌ ঠেঙাই?

—হাতে মারলেই মার হয় না। শখ-টখ গুলোকে কায়দা করে মেরে ফেলার নামও ঠেঙানি।

—রঞ্জু!

বিচ্ছিরি চীৎকার করে উঠেছিল অমর। পরে পরেই ভেবেছিল আত্মসুখী মেয়েদের লোভ বড় সাংঘাতিক। তা পাটে পাটে ঘুমিয়ে থাকে ভেতরে। সুযোগ পেলেই একদিন বিজ বিজ ঠেলে ওঠে বাইরে। চাদ্দিকের ঢং-ঢাঙে ভুলে গিয়ে জিভ নাড়ায়, ছোবল মারে। সেলফিস, সেলফিস্, রঞ্জু ক্রমশঃ সেলফিস হয়ে উঠছে।

আর কথা হয় নি রাতে। কেউ কথা বাড়ায় নি। প্লাটফরমের অচেনা যাত্রীর মতো যে যার পাশ ফিরে শুয়ে থেকেছে। সেই মেজাজ সকালেও সারাতে পারে নি অমর। সকাল থেকেই তার মুখ থমথমে। ভুরু বেঁকে কুঁচকে আছে। দুচোখে নির্বিকার নির্লিপ্ত। শব্দ করে রাগী হাঁটে সে। শব্দ করেও কাশে ও। রঞ্জুর দিকে মাঝে-মধ্যে তাকায়। রঞ্জুর গোমড়া মুখ। অমরের দিকে তাকিয়েও তাকায় না সে। এটা

ওটা কাজ করে। কখনও রান্নাঘরে, কখনও শোয়ার ঘরে যায়। তার মুখে অভিমান রেখা স্পষ্ট। চোখের তলায় জল চিকচিক করছে কি? পাত্তা দেয় না অমর।

ন্যাকামি। দ্রুত জামা কাপড় পরে ফেলে অমর। রান্নাঘরের দিকে আরেকবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। রঞ্জু চা বানাচ্ছে হয়তো। নিকুচি করেছে চা'র। ও খাবে। অপেক্ষা না করে ঠেলা দিয়ে দরজা খুলে ফেলে। গেটের কাছে চলে যায়।

—চা হয়ে গেছে, চা হয়ে গেছে, চেঁচিয়ে বলতে বলতে রঞ্জু দরজার কাছে দ্রুত পায়ে চলে আসে। ব্যথাতুর তাকিয়ে থাকে অপলক। দু'চোখ ছাপিয়ে জল বের হয়। যেন থৈ-থৈ বন্যা।

উত্তর দেবে কি? ফিরেও তাকায় না অমর। গেটের কাছে একটা যোয়ান-যান লোককে দেখে হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে যায়।

—কি চাই?

—ভিক্ষা বাবু

—হবে না। ভাগো।

—তিনদিন খাইনি বাবু।

—আমরা খেয়েছি নাকি? কাট, কাট শিগ্‌গীর কাট।

লোকটার কাকুতি মেশানো মুখ সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যায়। রুখ্‌কু কঠিন হয়ে ওঠে। ক্লোজ আপে হিংস্র দেখায়। প্রতিবাদে কি যেন বিড়বিড় করতে করতে চলে যায় সে।—ব্যবসা, স্রেফ ব্যবসা। উইথ আউট ক্যাপিটালে ভাল বিজনেস।

আজকাল নাকি ভিখারীদের নিয়ে রিসার্চ হচ্ছে। কারো কারো নাকি ব্যাঙ্কেও একাউণ্ট আছে। এইট্টি পারসেণ্ট নাকি স্বভাব ভিখারী। হা রিসার্চ। হাসি পায় অমরের। স্বভাব ভিখারী মানে? ইচ্ছে করে ভিখারী? ধুস্‌, বড় লোকেরা কি ভিক্ষা করে? রিসার্চ-টিসার্চ আসলে ধোঁকাবাজি। আসল সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া। সমস্যা তো একটাই। এবং তা খাওয়া-পরার। পরের গুলোই তো স্বভাবের, নেশার।

পায়ে পায়ে কথা জড়িয়ে দ্রুত হাঁটে অমর। এখন বসন্তের দক্ষিণ বাতাসে ফিনফিনে নেশা। শরীরে ঝিম ধরে। মনটাও হাল্কা মনে হচ্ছে তার। ভাবনা মোড় নেয়। নিজের ভাবনা, সংসারের ভাবনা তার মধ্যে আবার

ঢুকে যায়।

আসলে দোষ রঞ্জুর নয়। তারও নয়। তবে যে কার, সে ঠিক ঠিক বুঝতে পারে না। হয়তো সময়ের, নির্মম হৃদয়হীন সমাজের। পাশের বাড়ীর দত্তবাবুর এমন কি চাকরী? তারই মতো সরকারী কর্মচারী। তবে লাইসেন্স সেকসনে আছে লোকটা। প্রচুর পাবলিক কন্‌টাকট। টু পাইস হয় হয়তো। অবশ্য পাবলিক কন্‌টাক্‌টে তো সেও আছে। টেণ্ডার সেকশনে। ওখানকার মধু কি কম? শুধু কন্‌টাক্‌ট থাকলেই হয় না। এইসব ব্যাপারে কিছু আর্ট থাকে হয়তো, সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম, যাতে করে একতলা দোতলা হয়, দোতলা থেকে তিনতলা। বাড়ীর মেয়েরা শাড়ী গহনা পাল্টাতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে গায়ের রঙও।

তাহলে রঞ্জুর দোষ কি? কিছু সাধ-আহ্লাদ তারও তো থাকতে পারে। রঞ্জু কেন? চারদিকের এতসব দেখে টেখে যে-কোন মানুষের লোভ-টোভগুলো উস্‌কে উঠতেই পারে।

না। এটা ঠিক রঞ্জুর লোভ নয়। বাঁচার স্বাভাবিক ইচ্ছে-টিচ্ছেগুলো উঁকি মারছে যে। সত্যিই তো, কি দিতে পেরেছে সে? এক কণা সুখ, মুহূর্তের স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে কি? না। তাও দিতে পারে নি।

কোথাও বেড়াবার সামান্য শখ ছিল রঞ্জুর। কিন্তু তাও তো পারে নি অমর। মাথার ওপর তার লাইবেলিটি। মা, বাবা, বিবাহযোগ্যা বোন। সংসার চলে না তো বেড়াতে যাবে কি?

এই ভাবনা ভেতরে ঘুরতে থাকলে ক্রমশঃ নরম হয়ে আসে সে। রাগ-টাগ থাকে না। চোখ-মুখের বিরক্তি রেখা সরে যায়। একটা প্রসন্ন মেজাজ পেয়ে যায় হঠাৎ। এক লাফে একটা চলতি বাসে উঠে পড়ে।

হৈ চৈ করে ওঠে প্রকাশ। অমরকে দেখে এক চোখ বুঁজে ফেলে। দাঁত বের করে মাড়ি দেখায়। ওপর ঠোঁটের পাতা নাড়ায়।

—অমর যে, কতদিন পরে বল তো? কি খবর?

—কেন আসতে নেই?

—সেই তো, আসিস না কেন?

—যোয়ালে বাঁধা যে, সময় পাই না একদম।

—আজ পেলি তাহলে?

—না, মানে, একটা বিপদে পড়ে……

—কি ব্যাপার ?

—কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারিস ?

—কি হবে ?

—মানে, মিসেসের জন্য একটা স্পেশালিস্ট—

আচমকা থেমে যায় অমর। প্রকাশের চোখে চোখ রাখে। এরি মধ্যে মুখের আদল পাল্টে ফেলেছে প্রকাশ। অন্য কারো মুখ পরে ফেলেছে যেন। ভয়ংকর অচেনা মনে হয় তাকে। সেইদিকে চোখ রেখে তবু কাকুতি মেশানো গলায় অমর বলে—একটা স্পেশালিস্ট না দেখালে চলছে না প্রকাশ।

কথা বলে না প্রকাশ। অমরের দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। তার দুই ভুরুর মাঝখানে ছায়া নামে। ঘন গভীর ছায়া। ঠোঁট-বেঁকে যায়। নাকের পাটা ছোট হয়, বড় হয়। তাতে গুরুত্ব না দিয়ে আপন মনে অমর বিড়বিড় করে—মানে হাজার খানেক টাকা পেলেই······

বাইরে প্রকাশের কোন অভিব্যক্তি নেই। এক দৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকে। অনেক পরে নড়েচড়ে বসে। যেন একটা একস-রে মেসিন দিয়ে অমরের ভেতরের স্ন্যাপটা এইমাত্র তোলা হলো, এম্নি ভঙ্গিতে আচমকা বলে—এত টাকা শোধ করবি কি করে ?

—কিছু কিছু করে ইনস্টলমেন্টে দিয়ে দেব।

—এক ভদ্রলোক মাসে পনের পার্সেণ্ট সুদে টাকা ধার দ্যায়, যদি বলিস তো আমি জামিন থাকতে পারি।

—মাসে দেড়শ টাকা সুদ ?

—হ্যাঁ, সে রকমই পড়ে।

—দেব কি করে ?

—সেই তো। তারচে তুই মিসেসকে হাসপাতালে পাঠা। ধরা করা করতে পারলে আজকাল ভাল ট্রিটমেণ্ট হয় হাসপাতালে।

—তোর কাছে টাকা নেই ?

—ধুস্, দেখছিস না টাকার অভাবে বাড়ীটা অর্ধেক হয়ে আটকে আছে।

—তাহলে যাই।

বলেই আচমকা প্রকাশের ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে অমর। সিঁড়ি বেয়ে তরতর্ নেমে যায় নীচে। বিকেলের কলকাতায় মেলা বসেছে এখন। লোকে গাদাগাদি ভীড়। হাঁটা যায় না। গায়ে গা ঠেকে যায়। এপাশ বেঁকে

ওপাশ বেঁকে এইবার ধীর পায়ে এগোতে থাকে অমর।

আমি ভিক্ষে চেয়েছি নাকি রে শালা ? দয়া চেয়েছি ? ধার চেয়েছি তো। ধার না করে কে ? সবাই করে। অবশ্য দত্তবাবুর কথা আলাদা। ওর ধারের দরকার হয় না। আপসে টাকা চলে আসে। কিন্তু সেই আসাকে আমি ঘৃণা করি রে প্রকাশ, ঘৃণা করি।

যে যেমোন ডাঁরিয়ে আছেন তেমোন থাকিবেন বাবু। দোহাই ধরম। আপোনাদের মাতাজীর কিরা, পিতাজীর কিরা, এই লেড়কা তাহোলে গিরে যাবে বাবু। গিরে গিয়ে মোরে যাবে। দোহাই কামরূপ কামাখ্যা মাইকি! আপোনাদেরও ক্ষতি হোয়ে যাবে।

এইসব বলে একটা অবাঙ্গালী লোক খেলা দেখাচ্ছে। চোখ ভোলানো, মন মাতানো খেলা। বিরাট এক বোরখার ভেতর একটি ছেলে। শুইয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে। ও নাকি উঠে যাবে শূন্যে, অনেক উঁচুতে। দর্শকদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। বুকে আড়াআড়ি হাত রাখা চলবে না। নড়াচড়া চলবে না। জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া চলবে না। চারদিকে ভীড় করে থাকা মানুষজন চুপচাপ। ওদের চোখে মুখে ভয়, বিস্ময়। কি হয়—কি হয় জিজ্ঞাসা।

অমর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। অনেকক্ষণ। বেশ জমিয়েছে লোকটা। রোজগারের ভাল ফন্দী। এরপর নিশ্চয়ই পয়সা চাইবে, নয়তো মাদুলী বেচবে। আসলে কায়দা দেখিয়ে লোক-ঠকানো।

ভীড় থেকে সরে আসে সে। হঠাৎ নিজেকে হালকা লাগে তার! ফুরফুরে হাওয়া তার ভেতর খেলা করে। ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে ভেতরটা। আসলে জীবন মানে কায়দার খেলা। কৌশলে বেঁচে থাকা। কালই আরেকটা লোনের দরখাস্ত করবে সে। প্রফিডেণ্ড ফাণ্ড বা কোঅপারেটিভে। কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবে নিশ্চয়ই। একটু দেরীতে হলেও পাওয়া যাবে। অবশ্য একটু কষ্ট হবে। তাতে কি ? একটা টিউশন পাওয়া যাবে না ?

এইবার মেজাজে হাঁটে অমর। পায়ে পা ঠেকিয়ে যেন বল খেলছে এমন কায়দায় এগোতে থাকে তার সামনে লোক, পেছনে লোক, ডাইনে, বাঁয়ে হরেক বাধা। তবু সবাইকে ঠেলে-ঠুলে সে পাশ কাটিয়ে এগোতে থাকে মারকুটে খেলোয়াড়ের মত।

পরাজিত ঘোড়া

জীবন সরকার

১। বেঁচে থাকার ইচ্ছে অথচ কিছুই করবার নেই। নিঃসঙ্গ একাকী। জীবিকার জন্যে ভেতরের পশুটা ঘুমোয়।

২। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বীণা সিনেমার সামনে জল দাঁড়িয়ে খেলছে—খেলছে। নতুন ফুলের গন্ধের নায়িকা……শাবানা কিংবা শবনম্ কিংবা শাবানা বিপদ সীমার কাছাকাছি কাপড় রেখে হেলছে-দুলছে। উরুতে ঢেউ আর ঢেউ। নাহ্—ব্যাপারটা জবরদস্ত। রাধু কর্মকারের কম্পোজিশন শট্।

৩। ট্রাম নেই। ডবল-ডেকার স্টীমার হয়ে এগুচ্ছে। ঠিকানা ভাসছে। আই বাপ! এতনা জল।

৪। জীবন ভোর বাইলাম বৈঠা। নদীর কূল তো পাইলাম না। গহীন গাঙে মারলাম রে ডুব……দেবী দরশন হইল না। বেইল থাকতে ভবনদী পার কর আমারে।

৫। এই রিকশ।

৬। এই…এই…রিকশ।

৭। শাবানা কিংবা শবনম ডাকলে আমিও ডাকলাম এই রিকশ…এই…এই রিকশ। কাকভেজা লোকটা হতভম্ব। কোন্ দিকে যায়। একবার আমার দিকে তাকালে একবার ওদের দিকে তাকালে আই-বাপ। সটান ঘুরে ঐ দিকে চলে গেল। এই রিকশ। কে কার কথা শোনে। মহিলা না মেয়ে মানুষ। মন-ময়ূরী আমার।

৮। চোখের সামনে! একদম চোখের সামনে চলে গেল। বুকের হা-হা কপাট খুলে গেল। বুকের মধ্যে ঢেউ। এক সময় তা মিলিয়ে গেল!

৯। আমার পা। মাথা। বুক। ঠোঁট। কি বলে আমার পা। মাথা। বুক। তলপেট—হ্যাঁ—তলপেটে অসহ্য যন্ত্রণা।

১০। রাস্তা ফাঁকা।

১১। কিছুই করবার নেই। অতএব ফুটপাথে চলো। আমি নিঃসঙ্গ একাকী।

১২। শাবানা কিংবা শবনম। উরু কিংবা বিপদ সীমা ছাড়িয়ে অন্য কিছু। অতএব দমকলের ঘণ্টি বাজিয়ে দাও। দাও।

১৩। বন্য প্রকল্প লাল ফিতায় বাঁধা। বন্যা প্রতিরোধ কমিটির মেম্বারগণ ডিনার পার্টি'তে ক্যাবারে নাচ দেখছেন। তোবাঃ পার্টি নয়। রাণী-সাহেবার জন্মদিন পালন করছেন।

১৪। বেচারা করণিক।

১৫। বাস এল।

১৬। ময়ূরপঙ্খী নাও।

১৭। জানোয়ার না পশু। মশাই—পা-টা তো মাড়িয়ে দিলেন। ভেতরে যান। ভেতরে……

১৮। অসভ্য কোথাকার! বাড়ীতে মা-বোন নেই।

১৯। কী বললেন? মা বোন? হিঃ হিঃ হিঃ কেয়া বাত। মুক্তো ঝরছে—মাইরী……।

২০। চুপ শালা। রাখ বে বাতচিৎ। একটু-আধটু হাত লাগবেই। যা জিনিস। আসল যন্তর!

২১। শাবানা কিংবা শবনম্ লোকটার সঙ্গে লেপটে আছে! নাহ্ উদোম শরীরে জড়িয়ে আছে। আমি শালা? বেপাত্তা!

২২। ইচ্ছে হল ঝাঁপিয়ে পড়ি। ছিনিয়ে নিয়ে আসি। শাবানা কিংবা শবনমকে। আমার হাত শিরশির করছে। এই ভীড়ে প্রেম প্রেম খেলছে। আমি শালা—বেপাত্তা।

২৩। হেই দাদা! কী করছেন—করছেন কি? সামনে যাবার চেষ্টা করবেন না। যন্তর খুলে নেব। কে র‍্যা! রাবণ না মহীরাবণ।

২৪। আমার তো মাথা ঘুরে গেল। জানটা নিয়ে নেবে মনে হয়। অথচ শাবানা কিংবা শবনমের বিপদ সীমার কাছাকাছি কাপড় তার পরেই

ধবলগিরি। তোবা। তোবা।

২৫। জিহ্বায় বৃষ্টি নয়—ঢল। যা শালা। নেড়ী কুত্তা! কবজিতে তাগদ নেই। শালা! ভীতু কোথাকার। খালি আপশোষ।

২৬। বাসে যাওয়া হল না। ছিটকে বেরিয়ে এলাম। বাসটা চলে গেল। এক হাঁটু জলের মধ্যে হাবুডুবু। সি. এম. ডি. এ কী করল! কলকাতা করপোরেশন। এতবড় একটা চানস্ হাতছাড়া হয়ে গেল। বৃষ্টি কেন এলি। আমার শূন্য বাগানে মালি নেই। ফুল নেই। গাছ নেই। মালি নেই। ফুল নেই, গাছ নেই।

২৭। কাঁসর ঘন্টা। না—বে দমকলের ঘণ্টি। ঠনঠনিয়া কালীবাড়ী। মা কালী আমি তোমায় পাঁঠা বলি দেব। আমাকে সাহস দাও। আমি যে হারিয়ে গেছি।

২৮। করবার কিছু নেই। অতএব ফুটপাথে চলো—নিঃসঙ্গ একাকী। আই বাপ! ট্রাম। জব চার্ণক কলকাতায় এলেন। ঘোড়া গাড়ী এল। টমটম এল। তারপরে এল ট্রাম। ভদ্রলোকের গাড়ী।

২৯। ট্রামে যাই।

৩০। পকেটমার! পকেটমার!

৩১। সাবধান! সাবধান!

৩২। থানায় নিয়ে চলুন। সাংঘাতিক কান্ড। মেয়ে মানুষ পকেটমার!

৩৩। শাবানা কিংবা শবনম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। একি! সেই কাপড় নেই। সেই ভিজে শরীর নেই। চোখে বৃষ্টি। আই-বাপ! চোখে যেন নদী বইছে।

৩৪। শাবানা কিংবা শবনম কাঁদছে।

৩৫। বানুকে। জেনানা। একদম বানুকে।

৩৬। শাবানা—কিংবা শবনম কোন স্টেশনে নামবে।

৩৭। কোন ইস্টিশন।

৩৮। স্টেশনের নাম ভালবাসা।

৩৯। দুম করে মাথায় যেন কি পড়ল। আই-বাপ! মাথায় যেন কি পড়ল। কি যন্ত্রণা। বৃষ্টি পড়ছে। শাবানা কিংবা শবনম বিপদ সীমায় কাপড় তুলে হেলছে—দুলছে।

৪০। ট্রাম চলে গেল। শাবানা কিংবা শবনম চলে গেল।

৪১। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ……

৪২। শাবানা কিংবা শবনম অভিনয় করছে।

৪৩। —পৃথিবীময়।

৪৪। আমি বুঝতে পারিনি। বোকা। আসলে বৃষ্টি। জল, নৌকা, গহীন গাঙ। ফুল। বাস। ট্রাম। রিকশ। সিনেমা হল। কোথাও আমার জায়গা নেই।

৪৫। নিঃসঙ্গ একাকী। কিছুই করবার নেই। সমস্ত বাগানে পরাজিত নায়ক। অতএব ফুটপাথে চলো—নিঃসঙ্গ একাকী।

শ্যাম থাপা ও বাংলা সাহিত্য

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

এ বছরের খেলার মরশুমের সবচেয়ে ভাল সবচেয়ে কার্যকারী গোলটা করেছে শ্যাম থাপা। ওর দেওয়া গোলে মোহনবাগান তার চির প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়েছে। এর আগেও মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলায় শ্যাম গোল করেছে। কখনো মোহনবাগানের পক্ষে কখনো ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে। তবে এবারের গোল ছিল সত্যিকারের নয়নাভিরাম। গোলের দিকে পেছন করে ওইরকম তড়িৎ গতি সট মাটিতে পড়ে গিয়ে, খুব কম দেখা যায়। ফুটবলের রাজা পেলেও এ ধরণের গোল খুব বেশী করেন নি।

সঙ্গে সঙ্গে একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেল। শ্যামের কাছ থেকে সবাই দর্শনীয় গোল আশা করতে লাগলো, আর তার ফলে বাকী মরশুমে শ্যাম আর তেমন গোল পেলই না। আই. এফ. এ শীল্ডেও না। সন্তোষ ট্রফিতেও না। আর এর জন্য শ্যাম জাতীয় দলেও ঢুকতে পারল না। শ্যামের শাস্তিটা একটু বেশী হয়ে গেছে। হয়তো খেলার কারণ ছাড়া অন্য কারণও আছে। কিন্তু শ্যামের ভাগ্যে যা হয়েছে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যেও তার নিদর্শন পাই।

নবনীতা দেব সেন দারুণ লেখেন। এ ধরণের লেখক বাংলা সাহিত্যে বেশী নেই। মননশীল লেখা, কবিতা লেখা, ছোটদের জন্য নিটোল গল্প লেখা, বড়দের জন্য ভাববার মতো গল্প লেখায় তাঁর তুলনা মেলা ভার। সব্যসাচীর দুটো হাত সমানে চলে কিন্তু নবনীতার বেলায় দুহাতে কুলোয় না। তাঁর মস্তিষ্কের খোপগুলি প্রত্যেকটাই সু-উন্নত। তাই ওঁর কোন লেখা খারাপ হয় না। তাই উনি যখন মেসোমশাই-এর গল্প লিখছিলেন তখন সেটা দারুণ হয়েছিল। প্রত্যেকের মনে হয়েছিল যে তাঁর মেসোমশায় (কিংবা কাকা কিংবা পিশে কিংবা অন্য কোন আত্মীয়) সম্বন্ধে জেনেশুনে নবনীতা গল্প

লিখেছেন। ব্যস্ এখন সবাই ফরমাস করছেন লেখো মেসোমশায়ের গল্প। এবারকার পুজোয় নবনীতার কবিতা দেখি নি। অনবদ্য ভ্রমণ কাহিনীগুলিও পড়তে পাইনি শুধু বাঙাল আত্মীয়দের কথা পড়েছি। নবনীতার লেখার ভক্ত হিসাবে আমি আশা করছি নবনীতা আবার অন্যরকম লেখা লিখবেন। নবনীতা পারবেন। কিন্তু আরো অনেকের লেখা দেখছি যাঁরা বোধহয় এ-পথ থেকে ফিরতে পারবেন না। একজন হাসির লেখকের করুণ অবস্থা দেখে আমরা বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়ছি। ভদ্রলোক আমাদের হাসাতে গিয়ে নিজের কাছাকোছা খুলে বেজায় বেহাল হয়ে পড়েছেন। সত্যি বেচারার অবস্থা খুবই শোচনীয়। সপ্তাহে একবার করে হাসাবার দায়িত্ব নেওয়া কি সহজ কথা।

সমরেশ বসুরও এই দশা হয়েছিল। তিনি যখন বি-টি রোডের ধারে লিখেছিলেন তখন সবাই ধরে নিয়েছিল তিনি সাম্যবাদী লেখা ছাড়া কিছুই লিখবেন না। সমরেশ তাঁদের অবাক করে দিয়ে কালকূট হ'লেন। পরে বিবরের সন্ধান দিলেন। বিবর পেয়ে সকলে বেশ চনমনে হয়ে উঠেছিলেন। এই রকম লেখা একটার পর একটা পাবেন আশা করেছিলেন। সমরেশ তাঁদের নিরাশ করেন নি। কিন্তু উনি আবার নতুনতর জগতে গিয়েছেন দেখে ভাল লাগছে।

মহাশ্বেতা দেবী যে লিখতেন এ কথাটা অনেকেই ভুলে গিয়েছিল। এই ক' বছর মহাশ্বেতা থেমে থাকেন নি। কবি বন্দ্যঘটির অপূর্ব বৃত্তান্ত শুনিয়েছিলেন, আঁধার মাণিক গ্রামের কথা বলেছিলেন, বায়োস্কোপের বাক্স খুলে দেখিয়েছিলেন। গত বছর থেকে আবার কলকাতার নথিভুক্ত আঁতেলেকচুয়ালরা তাঁর সন্ধান পেয়েছেন। হাজার চুরাশীর মা লেখার পর যাঁকে "আবিষ্কার" করা যায় নি স্তনদায়িনীর পর তিনি নবরূপে আবিষ্কৃত হলেন। এখন তাঁর লেখা নিয়ে তুমুল হৈচৈ পড়ে গিয়েছে। "নবরূপে মহাশ্বেতা" বলে একটা জিগির উঠেছে। এখন নাকি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে নিপীড়িত মানুষের একমাত্র লেখক মহাশ্বেতা। অথচ মাত্র কয়েকবছর আগে ওঁর একটি রিপোর্টাজ বেরোয় 'সমতট' পত্রিকায়। সমতট এই লেখাটা পেতো না। একটি প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিকের সম্পাদক লেখাটি নাকচ করেছিলেন বলেই সমতট লেখাটি ছেপেছিলেন। অসাধারণ সেই লেখা। 'অরণ্যের অধিকার' ও অসাধারণ। একজন লেখক অভিজ্ঞতা আর সহানুভূতির সোপান পেয়ে উঠে আসেন সঙ্গে

সঙ্গে তাঁর লেখা পালটায় তাঁর প্রকাশের ভঙ্গী পালটায়। মহাশ্বেতার বেলায়ও তাই হয়েছে। তাঁর উপরি কৃতিত্ব এই ক' বছর কোনো প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা তাঁর লেখা ছাপান নি। তবু উজ্জ্বল হীরাকে ছাই চাপা দিয়ে রাখা যায় নি। আমার মহাশ্বেতার ওপর ভরসা আছে। তিনি সম্পাদক এবং 'এনকোর' দেওয়া পাঠকদের সামাল দিতে পারলেন। এবারের লেখা "বেহুলা" আমাদের নূতন করে সে আশ্বাস দিয়েছে

অথচ বাংলা সাহিত্যে এ ধরণের একই রকম লেখবার তাগিদ কিন্তু আগে ছিল না। শরৎচন্দ্র যদিও মোটামুটি একই সমাজ নিয়ে লিখেছেন, তবু তাঁর কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন স্বাদের লেখা পেয়েছি। তিনি যদি শুধুই চরিত্রহীন লিখে যেতেন তাহলে এ স্বাদ আমরা পেতাম না। শরৎচন্দ্রের বই-এর অসাধারণ বিক্রীর কারণই তাই। আর অন্য যাঁরা ছিলেন তাঁরা তো তাঁদের বহুমুখী প্রতিভা দিয়ে বাংলা ভাষাকে সরস করে গিয়েছেন। বাঙলা ভাষা-ভাষী বলতে যার জন্য গর্ব বোধ হয়। মাইকেল বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথকে ছাড় দিই। পরশুরাম, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়রা এই তো সেদিন পর্যন্ত লিখেছেন। এই সেদিন পর্যন্ত উৎসুক হয়ে থাকতাম কবে পূজা সংখ্যা বেরোবে। এই পূজা সংখ্যাতেই প্রথম রটন্তীকুমার পড়েছি। এখানেই আরোগ্যনিকেতনের প্রথম খসড়া সঞ্জীবন ফার্মেসী পড়েছি। আমার প্রিয় লেখকরা কি লিখবেন তাই দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতাম। আজও আমার বহু প্রিয় লেখক আছেন কিন্তু আজ আমি জানি তাঁরা কি লিখবেন! অন্তত কি ধরণের লেখা লিখবেন সে বিষয়ে আমার প্রতীক্ষা করার কিছুই নেই।

আসলে আমাদের সাহিত্যে যে ধারা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা আমাদের জীবনযাত্রার মধ্যে যে বদল এসেছে তারই ছাপ। আমাদের দেশের সভ্যতার মূল ভিত্তি ছিল যৌথ-পরিবার। সেই যৌথ-পরিবার আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। তার ভূতটাই শুধুমাত্র আমাদের কাঁধে চেপে রয়েছে। আমি যৌথ-পরিবারের গুণগান করছি না। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারে এসে কলকাতায় দাঁড়িয়ে যৌথ-পরিবারকে সমর্থন করা যায় না। কিন্তু বিগত সেই প্রথার মধ্যেও কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। যৌথ-পরিবারে পরিবারের লোকরা একই রকম হতেন না। তাঁরা ভিন্ন মতাবলম্বী হতেন ভিন্ন ভিন্ন কাজ করতেন। আমার বাবার ছোট মামা দারুণ যাত্রা করতে পারতেন। এত সুন্দর স্নো বানাতেন যা তা বাজারের

স্নোকে টেক্কা দিত। বাবার মামাবাড়ীর বিদ্যায় নাম ছিল। বাবার মামারা এই একদম বেমানান ছেলেটিকে নিয়ে কি করবেন ভেবে উঠতে পারতেন না। কিন্তু তিনি সংসারে বৈচিত্র্য এনেছিলেন। আজকের যুগ অন্য। আজ আমাদের বাড়ী নেই। ফ্ল্যাট আছে। সে ফ্ল্যাট একদম ছাঁচে গড়া। পাশের বাড়ীও যা আমার বাড়ীও তা। আসবাব পত্রও এক। স্বামী স্ত্রীরা সব ফ্ল্যাটে এক রকম দেখতে। আমাদের জীবনযাত্রাও ক্রমশঃই পশ্চিমের নকলে হয়ে উঠছে। জামা জুতো প্যান্ট শার্ট ম্যাক্সি মিনি মিডি সবাই একই রকম পড়ে। আমরা জানি অফিসার আর কেরাণীর পার্থক্য। মোটামুটি সবাই যে যে খুপরীতে আছি সেই খুপরীর নিয়ম মেনে চলি।

রাজনীতিতে এই খুপরীতন্ত্র তো একটা মারাত্মক জায়গায় এসে পৌঁছেছে। যেখানে একমাত্র লক্ষ নিজের দলের সুযোগ সাধন। অন্য সব কথা পরে। অন্যসব কথা বাহ্য। জীবনে আমরা তাই অনেকটাই এক ধাঁচের ছাঁচে ফেলে নিয়েছি। পৌনপৌণিকতাই সভ্যতার মূল বলে মেনে নিয়েছি। অন্তত যান্ত্রিক সভ্যতার তো বটেই। তাই আমাদের সাহিত্যেও আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি কে আমাদের কেচ্ছার গল্প বলবে, কে আমাদের পাগলা আত্মীয়দের গল্প বলবে আর কে শোনাবে নিপীড়িত মানুষের কথা। আর আমরাও একই কথা বারবার শুনতেই চাইব।

এবারকার দুর্গাপূজার একটি মণ্ডপে শ্যাম থাপার গোল দেওয়াটা আলোয় দেখানো হয়েছিল। ভবিষ্যতে হয়তো বাংলা সাহিত্যের ঘটনাও দেখানো যাবে। আশা করি তার আগেই ক্যানসার কিংবা হৃদরোগ কিংবা অন্য কোন রোগ বা দুর্ঘটনা আমায় ওপারে নিয়ে যাবে।

● কবিতা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ইশারা

যেখানে তোমার ছায়া
খরস্রোত জলে কাঁপতে গিয়ে
হার মেনে আচমকা
ডাক ছেড়ে উড়ে যায়
তীরবেগে ফুলঝুরি পাখির মতন ;
নিঃশব্দ জঙ্গল এসে
পা টিপে পা টিপে
পেছনে ওৎ পেতে থাকে
একবার পিছলে পড় যদি ;
সেখানে অতল থেকে
ঝলমলানো জলের বিদ্যুৎ
মাঝে মাঝে দেয় যদি
রুপোলী ঝিলিক ;
জেনো সে ত মাছ নয়,
যে সব কল্পনা
কলমের ফাঁদে ধরা
পড়তে গিয়ে
ফস্কে গেছে কৌতুকে পালিয়ে
তারাই ইশারা করে
কটাক্ষে বিলোল,—
নেমে এসো
গাঢ় স্রোতে নেমেই দেখো না ॥

তাপস ওঝা

বন্ধ ক্ষুধা

রঙের রাত হাতের কাছে
বন্ধ ক্ষুধা প্রেমের ছিল, প্রেমের আছে ঃ
তোমার চোখ, তোমার মুখ সবুজ ছিল
ব্যর্থতারা নদীর মত সহজ ছিল
হাতের কাছে প্রেমের গাছ, ক্ষুধার ফল
কিম্বা বিশাল শকুন ফেলে চোখের জল
সেই শকুনের ডানার ছায়ায় আমিই ছিলাম
ব্যর্থ সবুজ আমার চোখের করুণ রূপ ।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তোমার কাছে

তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি আমি,
যদিও অনেক দেরী হলো ।
তোমার মাথার সমস্ত চুল এখন সাদা ;
আমিও আর শিশুটি নেই, তোমার পায়ের শুকনো পাতা
চোখের জলে ধুয়ে দেবো ।

কী করে যে ক্ষমা চাইবো ? তোমার মাথার সমস্ত চুল
এখন সাদা ;
এই কী ক্ষমা চাওয়ার সময় ! অথচ দূরে ঘণ্টা বাজছে,
আর দেরী নয়—যেতেই হবে ।
আর দেরী নয়—অথচ কত বছর তোমার মুখ দেখিনি ।
কত বছর চোখের জলে তোমার পায়ের ছায়া পড়েনি,
কত বছর···

হাসির আড়ালে

কি অসুখে আমি ভুগি
সে খবর রাখে না তো কেউ
হাসির প্রলেপ মুখে
বুক জুড়ে বেদনার ঢেউ
বয়ে তো চলেছি আমি
সেই শিশু বয়সের থেকে ;
তখন থাকে নি চাপা
আপাতত রাখি তাকে ঢেকে ।

ছলাকলা মানুষেরা
বয়েস হলেই জানি শেখে
হাসি খুশি লোক আমি
মানুষী কেতাবে তাই লেখে ।

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজবংশী কবিতা

কুনঠে হাতে আসি জুটিল ভাটি মানুষির ঘর
উতোর-দখিন-পুব-পছিম উঠিল বালার ঝড়
নেহেলানি কান্দন শুনি নরম হইল মন
সাজিনা-বিছিনা পাতি দিনো বাপুর তন
আজি হৈতে বদলে গেল তিস্তা-তোরষার মাটি
সগাকে বুকতে ধরি দুখি জনমভূমি খাঁটি ।

নদীর ধারিৎ হাঁটু গাড়ি তিস্তা বুড়ীক কও
আতি-দিনে ভাঙিলে পাড়ি কেমন করি রও
ছোওয়া-পুতো-ভাতার ধরি নাখিলা নোকের দিন
বুকের ভিতর তুলিয়া রাখি কালা-ভালার চিনু ।

[কুনঠে—কোথা থেকে । নেহেলানি—লোক দেখানো । বালার—বালির । ভাতার—স্বামী । ধারিৎ—পাড় । সগাকে—সকলকে ।]

ভিজে বাতাস

গ্রীষ্মের নিষ্ঠুর নির্যাতন শেষ
আকাশে এখন পালাবদলের পালা
ছায়া ছায়া মেঘ ভেসে ভেসে যায়
মেঘে মেঘে কিছু জটলা ।

এ-জটলা কোনো জটিলতা নয়
এ শুধু মাঙ্গলিক প্রয়াস
এ-জটলা কোনো কুটিলতা নয়
ভিজে বাতাস বয়, ভিজে বাতাস !

আনন্দ বাগচী

শিল্প ও কলার খোসা

মোমের আলোর নিচে সারারাত আমি আর আমার কলম
নশ্বর ছায়ার মধ্যে ঠাঁই বদলের খেলা খেলি
নিকট নিশ্বাস এসে বুকে লাগে, চোখ বাঁধা বিষণ্ণ রুমালে ।
নিরন্তর এ খেলায় বেলা যায়, কলস ডোবে না
চোখের সামান্য জলে, আকাশ উপুড় হয়ে আছে
শব্দহীন প্রতিপক্ষ চেয়ে থাকে সব পথ ঘুরে আসবে বলে ।

ফাটা আয়নার মধ্যে রক্তাক্ত রোদ্দুর বিঁধে আছে
এ খেলায় হেরে যাচ্ছি, হাতের লুকোনো তাস টেনে
ছুঁড়ে দিচ্ছি সব ছবি লোকচক্ষে প্রকাশ্য রাস্তায়
উদাসীন জনস্রোত কিছুই দেখে না ঘরে ফেরে শুধু
দ্রুত ব্যস্ত ঘরে ফিরে যায় ।

শিল্প ও কলার খোসা পড়ে থাকে উদাসীন জুতোর তলায়
পিষ্ট হয় ।
নশ্বর ছায়ার মধ্যে সারারাত আমি আর আমার কলম…

কমলেশ সরকার

নীল ফটোগ্রাফ

'আবভাব' দেখে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। মাঠের ভেতরে একথাল রোদে বসে
গালে হাত যে ওই মেয়েটির।
চুপি চুপি কাছে গিয়ে কি যেন বলেছি—
'এই নে এই তোর ভাব-ছবি কাল বিকেলের'—নীল ফটোগ্রাফ।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অবশেষে

সরিয়ে দিই সমস্ত মন চঞ্চলতা,
আকাশ বায়ু নীল অরণ্য
শাল পিয়ালের গোপন ব্যথা
উল্লাসী মেঘ রোদের হরেকরকম কথা।

সরিয়ে দিই সমস্ত বাস চঞ্চলতা,
মাটির নীচে শিকড় চেনার দায় দুরন্ত
উইয়ের ঢিপি
সাপের আঁকাবাঁকা চলন
আকাশ এবং মাটির নীচুস্বরের কথা,
পাহারাদার! তোমার অঙ্গে বর্বরতা।

দিলীপকুমার কোনার

আকাশে নিষ্প্রভ তারা

গাছেদের আত্মরতি বর্ণহীন রিক্ততার ভারে
ঝরিয়ে ফেলেছে পাতা; পরিব্যাপ্ত যযাতি-জীবন
সভ্যতাকে ঘিরে রাখে রণক্লান্ত তীক্ষ্ণ হাহাকারে—
গান হয়ে ফুটে ওঠে পরাভূত রক্তের রোদন।

অজস্র বিন্যস্ত গূঢ় দ্বৈপায়নে একা একা জ্বলে
নির্জন মোমের বাতি; আদমের পৃথিবীতে, হায়,

বাসনার পরাভবে বাসা বাঁধে পরিণত ফলে
কতো না কামার্ত কীট: স্বপ্ন ভাঙে।—স্বপ্ন ভেঙে যায়।—

কর্কশ সময়ে বাঁচে নিরানন্দ মানবীয় প্রেম,—
ক্ষুধিত জিরাফ যেন পত্রহীন অরণ্যের দিকে।
মনন-মিনারে নেই সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত হেম:
সময়ের তাজা রঙ ক্ষয়ে ক্ষয়ে হয়ে গেছে ফিকে।

আকাশে নিষ্প্রভ তারা; হর্ষ-ভরে জাগে ধূমকেতু;
নদীর ও-পারে যাবো অন্ধকারে দেখি না যে সেতু॥

তাসাদ্দুক হোসেন

মধ্যবিত্তের রোজনামচা

বাজারে বাজারে আগুন শুধু আগুন।

অসহায় দুর্বলতা মুখ লুকোয় অক্ষমতার আঁচলে
দুর্মূল্যের প্রতিযোগিতায় বিক্ষুব্ধ ঝড় বাতাসের গায়ে গায়ে
অবসন্ন দেহে ক্লান্তির পাণ্ডুর ছায়া। তাই
পথ খুঁজে খুঁজে ফেরে যেন মন
পালিয়ে পালিয়ে বাঁচতে চায় জীবনের যত অলিগলি পথ

উড়ে বেড়াতে চায় স্বপ্নিল এক রাজ্যে যেন
ডানা মেলে পাখির মতো আকাশে আকাশে
ঘুমাতে চায় পরম নিশ্চিন্তে সব ভুলে শিশুর মতোন।
কতো মধুর হতো খুঁজে পেতো যদি কিংবদন্তীর সেই
সোনার কাঠি রুপোর কাঠি আহা!

জাল বোনে বাতাসে দীর্ঘশ্বাস
ঘুমেরা যেন লুকোচুরি খেলে
আবির ছড়ায় জীবনের ব্যর্থতা এক রাশ মুঠো মুঠো।

আর বার বার দরজার কড়ায় শব্দ তোলে
অসহিষ্ণু সেই এক দল পাওনাদার।

কৃষ্ণসাধন নন্দী

প্রিয়জনকে

একান্ত প্রিয়জনকে সমস্ত কিছুই বলা যায়
সমস্ত কিছুই

অবিরল জ্যোৎস্নাধারার গল্প
মেঘলা দিন

নলেন রসের সকাল
বকলস বাঁধা কুকুরের লাঞ্ছনা
সিঁদুরে আমের টক রস
লুকোলে ভেতরে হিসহিস, নদী বাঁক নেয়

একান্ত প্রিয়জনকে সমস্ত কিছুই দেওয়া যায়
সমস্ত কিছুই

মুঠো ভর্তি ধুলো একরত্তি সোনা
দাঁতে কাটা চিনে বাদাম
গন্ধমাখা ঘি ভাত
না দেওয়ায় প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ
আলগা বাঁধন

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

বর্ষার বাণী

হঠাৎ যখন বর্ষা নামে
কেবল তখন কেবল তখন
মনের ভেতর ঘন্টা থামে।
ঘড়ি ঘরে—
হাজার রকম, সে শব্দ সবাকে চুপ করে।
ধুপ করে নয়, ধুপ করে নয় ঠিক সুরে
মনের সেতার রেওয়াজ চালায় প্রাণপুরে;
তানপুরা-তার বাঁধার লীলায় শুধু যে মাতায় হাতে হাতে
দরজা আগল পথের মাতন সব চলে তবু যাতে তাতে।

একটি কাজের একটি প্রেমের
একটি সুরের রাগ নিয়ে,
আলাপ-বিলাপ সব দিয়ে—
সবকিছু কাজ সব সবুজের
হাজার নবীন রঙ রূপে,
আকাশ শোভার ছবির লীলায় চোখ চুপে—
ঠিক জানি,
আশার আলোর পায় বাণী।

অপরাজিতা গোপ্পী

বাতাসে বারুদের গন্ধ

বর্ষণ ক্লান্ত বাতাসে বারুদের গন্ধ।
এখানে বাতাস সতর্ক, স-চকিত।

রণক্লান্ত সৈনিকদের শিবিরে,
ক্লান্তির অবসাদ নেমে আসে।

অদূরে সূর্যাস্তের বিলীয়মান আভা
ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়, নদী
অরণ্যের বুকে।

এখনও সন্ধিপুজোর
সময় হয়নি।

নবান্নের মাঠে অশ্রুর
লবণাক্ত স্বাদ.
এখনও ঝরে পড়ে।

নিয়ত বঞ্চনার জ্বালা
নিশ্চিন্ত রাত্রির ঘুম
কেড়ে নিতে চাস।

এই মুহূর্তে কোন উৎসব নয়।
তমিস্রা রাত্রি ঘিরে
ষড়যন্ত্রের নিঃশব্দতা।

শত্রু শিবিরে তুরঙ্গমের দ্রুত
আনাগোনা,
মধ্যরাতের বিস্তীর্ণ বালুচরে,
ঝড়ের সম্ভাবনা,
স্তব্ধ—অগ্নিগর্ভ।

এখনও পৃথিবী জুড়ে
শোষণের ষড়যন্ত্র, ক্ষমতার দম্ভ
দাসত্বের শৃংখলে,
মানুষকে রেখেছে
শৃংখলিত করে।

তাইতো বর্ষণ ক্লান্ত বাতাসে,
বারুদের গন্ধ,
গোধূলির আকাশে ঝড়ের সংকেত
বয়ে আনে॥

প্রণব মাইতি

দেওয়ালে, দেওয়ালের গল্প

সংসারের চারপাশে দেয়ালকে সাক্ষী রেখে
একটি মানুষ চোখ বন্ধ করলো
দেওয়াল চিৎকার করলো চোখ খুলুন
চোখ খুলুন দুচোখ খুলুন
আলমারির থরে থরে রচনাবলীর ভাষ্য
বলে উঠল আন্তরিক করুণ ভাষণ

দেয়ালে ভাষার সাথে ধেয়ানের শব্দবোধ
মিলেমিশে এক হয়ে গেল না কিছুতে
এমন সময়ে দ্যাখা, দেওয়াল লজ্জা পেল
মানুষের শীর্ষাসন আদিম জীবন
কিন্তু তার চোখ বন্ধ জন্মের পোষাক পরা···

গেরস্তালি কেঁদে উঠল শিশুর কান্নার মতো
সবুজ দেয়াল থেকে নিশ্বাস প্রশ্বাসক্রম
ধ্যানের শব্দাবলী মিলেমিশে রচনাবলীতে
এইভাবে মানুষের জন্মমৃত্যু
দেখে নেয় প্রাত্যহিক তৃতীয় দেয়াল

অভিজিৎ ঘোষ

কবি ভাবনা

উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো কবি হেঁটে যান ; তিনি ভাবেন
স্বপ্নের জটিল সূত্রের সঙ্গে এ জীবনের কোন মিল নেই
অনবসর এই যাত্রা থেকে তাঁর পরিত্রাণ নেই
তিনি ফিরে আসেন নিরানন্দ ঘরে
সান্ধ্য বারান্দা দিয়ে দেখা যায়
দিগন্তে ঝুলে আছে দ্বিতীয়ার চাঁদ

ঘণ্টা বাজে দূরে—যেন লোক লোকান্তরে যেতে হবে
চলে যেতে হবে বলে ডাক দেয় বিশ্বচরাচর
জীবনের সর্বশেষ বেদনার গান
ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর ধ্বনি রেখা টেনে দেয়
বাতাসের বুকে···

উদাস চিন্তার ফেণায় কবি ভাসেন দারুণ একাকী
ক্ষণিকের পটে আঁকা জীবনের ক্লান্ত এই ছবি
ভেসে যায় নিরুদ্দেশ স্রোতে
বসন্তের শেষে—ছিন্নবৃন্ত খসে পড়ে শিশিরের জলে···

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাকে জাগিয়ে রাখে

সারাদিন এইভাবে কেটে যাচ্ছে নিদারুণ অন্যমনস্কতায়
দূরে নীলের চাঁদোয়া জোড়া আদিগন্ত বিস্তৃতি
পাহাড়ের সৌন্দর্য এই সাবলীল গ্রামে আছে
মানুষের ভালবাসা আমাকে দিয়েছে প্রচ্ছন্ন মহিমা
তবু সারাদিন এইভাবে কেটে যায়   কেটে যাবে।

অলৌকিক জলযানে এখানেও জলের কিনারে তারা ভিড় করে
শুভ্রপালের হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয় গভীর টান
আর ওই গ্রামের মানুষ খোঁজে না অন্যমনস্কতা
আমাকে জাগিয়ে রাখে   ঘর গেরস্থি দেখায়
ভালবাসা দেয়
দেখিয়ে দেয় তাদের ছন্নছাড়া প্রবাসী জীবন।

সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আগুনের মধ্য দিয়ে

আগুনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাও, হে মণিকাঞ্চন,
যে দিকে ফেলবে চোখ, তারা যেন ছটফট করে মরে যায়
যদি সে কু-জন,
অথবা হাড়-ও-ত্বক-সার লোক ভিতরে মুচড়ে উঠে
সগরপুত্রের মতো ভস্ম থেকে কলকল উজ্জীবিত হয়, উচ্ছলিত হয়,
রবীন্দ্র সঙ্গীত যেন গৃহস্থালি বাসন-কোসন-ভরা
মাটিতে আছড়ে পড়ে ধসে না বিলুপ্ত হয়ে যায়?
আগুনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাও,
সোনার শরীর যেন আগুনের মধ্য দিয়ে আরো সোনা হয়
গান হবে তীক্ষ্ণ এক ঊর্ধ্বলোক ফলা—

হাঁটো
এ ঘর ও-ঘর থেকে আরো ঘরে যাও,
মাংসের সুখের দেহ স্বর্ণধাতু অনিভন্ত অজয় অক্ষর,
সোনার চুমুর জলে ঝলমলে মুগ্ধ আঁখিপাত।

শোভন সোম

দ্বি

চলাচলের অনভ্যাসে কিছু রাস্তা মুছে গিয়েছে
পাহারাদার বনস্পতি রয়েছে কিছু রাস্তা জুড়ে
কাঁটাগুল্মের প্রসারতায় কিছু রাস্তা গিয়েছে ঢেকে

যে সব রাস্তা একদা ছিল সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ
সে সব আজ চিহ্নহীন।

প্রতিনিয়ত বিলিয়ে দিই সদর জমি ফসল ক্ষেত
আকাশগঙ্গাচোখেরজলেউদোমবুকের আর্তনাদ
ফুরোয় না যে, কিছুই তবু ফুরোয় না।

কেবল আমায় আগলাতে হয় নতুন জাগা অশেষ ভূষণ
বিশদ শোক বিদল স্মৃতি
পরাজয়ের বিকট গ্লানি ভালবাসার বিমল আলো
ফুরোই না যে, তবু কিছুতে ফুরোই না।

প্রফুল্ল মিশ্র

বাঁক মিলে যায়

হয়তো স্মৃতির উজানে নেই জলের শিহর
বনপথেও নেই জলের বাথান
সোঁদা বাতাসের ঘ্রাণ ক্রমক্ষীয়মান
নদীর নিবিড় খাত বহুদূরে।

তবুও বাতাস—
তার সাবলীল পথে বয়
কোথাও উষ্ণতার স্পর্শ—শুষে নেয়
বইয়ে দেয় জল অথবা
জলের মতো কিছু ঘ্রাণ !

এবং এভাবেই আমরা এগিয়ে যাই
কখন কোথাও জানি বাঁক মিলে যায়

কৃষ্ণ ধর

মানুষের ঘরবাড়ি

এইখানে একদিন মানুষের ঘরবাড়ি বানানো হবে
এই পাথুরে পোড়ো জমিতে গড়ে উঠবে
এক একটা নিজস্ব বাড়ি মানুষের।
এই আকাশের নিঃসঙ্গ নক্ষত্র
তখন রাত্রির অন্ধকারে অনেক প্রতিবেশী খুঁজে পাবে।

মানুষের ঘরদোর না হলে
এত বড় মাঠে হাঁটতে কেমন জানি গা ছমছম করে
নিজের পায়ের শব্দেই চমকাতে হয় বারবার।

খালি পোড়ো জমিতে মানুষের নিজস্ব ঘরদোরই মানায়।
তারা এসে একদিন এখানে বিস্তর গাছপালা লাগাবে
অনেক ফুল ফোটাবে এই ন্যাড়া ডাঙ্গায়
বানাবে কুয়োতলা, সব্জির বাগান, ছায়াবীথি
বৃষ্টি আর রোদকে ধরে রাখার জন্য।

চিত্রভানু সরকার

নদী

সেই গোপন খবর পাওয়ার পরে, পরেই
ছুটে গিয়েছিলাম পিপাসা নদীর পারে
উপমাহীন সৌন্দর্যে টলমল করছিল
নদীটির জল।

তারপর পৃথিবীর বয়স বেড়েছে এবং
আমাদের।
এখনও জ্বরে পারদের মত দুঃখ বেড়ে গেলে
ফিরে আসি নদীর কাছে
নবজাতক শিশুর মত খেলা করি তার মেঘপুঞ্জে
তার কাছে এইভাবে নির্বাপিত হতে থাকে সমস্ত অসুখ।

শ্যামাদিত্য মজুমদার

বন্যা

আজ বাংলা বন্যা কবলিত হয়ে
পঙ্গু প্রায়
সাত কোটি মানুষের চার কোটিকে
গ্রাস করেছে এই বিধ্বংসী বন্যা
ভিক্ষা ঝুলি হাতে নিয়ে বেরিয়েছে
বাকি তিন কোটি, বাঁচাতে এদের।
কিন্তু ওরা নিজেরাই বাঁচলো
এদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে।

নির্মল বসাক

পুনর্বার—২

পুনর্বার মৃত্যুর মানে যেন পাই পুনর্বার
কবিতা অথবা তোমাকেই নারী
যতদূর পারি রাখি বুকের সান্নিধ্যে
ক্রুদ্ধ সমুদ্র আর শান্ত বেলাভূমির ঠিক মাঝখানে
তুমি হাঁটো কর স্পর্শ চাই
তুমি নিজেকে ছিটিয়ে দাও যেন জল
যেন ঢেউ কেউ নেই কিছু নেই উদাস সমুদ্র আর উদাস পৃথিবী
মাঝখানে সাবলীল লীলা
সমুদ্র আকাশ লীন সেদিকে কবিতা
অথবা কী নারী অনায়সে নিজেকেই নিয়ে যেতে পারি

যদি আলিঙ্গন দাও   তুমুল সংঘর্ষ যদি হয়
তবু তো পেলাম   নীল জলে সবুজ পাথর
ঢেকে যেতে যেতে যেখানে বিচ্ছিন্ন হয়   সেখানেই
তুমিই কবিতা   অথবা তোমাতেই নারী—

মৃত্যুর মানে যেন পাই পুনর্বার

বিপ্লব চন্দ

বলতে পারি, বলতে হবে

বলতে পারি, বলতে হবে, বলার জন্য ছুটে যাওয়া
আমায় নিয়ে নষ্ট করা
যেমন মুণ্ডুটাকে ধড়ের থেকে কুপিয়ে নেওয়া।
আমার ছিল অনেক আশা, সোনায় মাটি কামড়ে থাকা
ফসল বোনা এবং মাটি আদুল গায়ে
ধুলোয় অঙ্গ নিদ্রা যাওয়া কিংবা আমার হৃদয়খানি
মানে আমার জন্মভূমি, মুক্তো পাখী, স্বাধীন জমি
বলতে পারি, বলতে হবে, বলার জন্য ছুটে যাওয়া
আমায় নিয়ে নষ্ট করা
যেমন মুণ্ডুটাকে ধড়ের থেকে কুপিয়ে নেওয়া।

গত সনে ধানের আকাল, আমার জমি কিছু মাতাল
ক্রোক করেছে যেটুকু চাল ঃ   সামান্য সেই মুখের গ্রাসে
চললো পেসন মহাত্রাসে—আকাল এলো আকাল
রক্তে, ঘামে ভিজলো চাতাল, দেশের যে হাল
গরীব দুঃখী পাশার চাল।   হেলা-ফেলা
লুট-তরাজী, যেমন খুশী সেই মহাকাল
আসল কথা – ভরিয়েছিলো এই মাটিতে গুণ্ডাবাজী।
বলতে পারি, বলতে হবে, বলার জন্য ছুটে যাওয়া
আমায় নিয়ে নষ্ট করা
যেমন মুণ্ডুটাকে ধড়ের থেকে কুপিয়ে নেওয়া।

কোথায় যাও, এসো—

তুমি যে যাও, কোথায় যাও, এসো—
ওদিকে শিরায় আগুন জ্বালে না শরীর
ঘাসের চাঙড়ে শুয়ে থাকে হিমরাত
ওখানে ফসল উগ্রোয় অভিমান ;

ওই মাঠে জমে বর্ষাধোয়ানি জল
আউশ আমন বোরোধানে ডুবগলা
মানুষ ডুবেছে, পায়ে নেই থিরমাটি
মাঠে হামড়িয়ে পড়েছে ভাদরদিন ;

ভাতঘুমপ্রিয় মানুষ জেনেছে, রাত
পোহালেই পাখি, রোদ্দুরে মাথা দিন—
জানেনা মেঘের গুমরানো রাগ ফুঁসে
খার করে দেয় সোনার চাঙড় রোদ ;

এইখানে রাত এখনো তরুণী ঢের
ফেনা-উজ্জ্বল পানীয়ও চায় ঠোঁট
পথ ফুরুলেই ফের শুরু হয় পথ
এই পথ ধরে সোজাসুজি গেলে ভোর—

তুমি যে যাও, কোথায় যাও, এসো—
এখানে বাসর গড়েছে সোনার রোদ
ঠোঁটে উসখুস অনুরাগ ফুটে ওই
চুমু দিয়ে যাবে মুনিয়ার লাল ঠোঁটে—

আমার এখন ভালোবাসার সময়

আমার এখন ভালোবাসার সময়
আমি এখন ইচ্ছে করলেই
ভালোবাসার প্লাবন বইয়ে দিতে পারি
আমি এক উড্ডীন শ্রান্ত পাখী
খ‍ুঁজে ফিরছি মাধবীর ছায়াঘেরা সুশীতল আশ্রয়
বহুদিন আমার চোখে ঘুম নেই
আমি ঘুমুবো, আমি ঘুমুবো…

আমার এখন ভালোবাসার সময়
আমি এখন ইচ্ছে করলেই
কারো হৃদয়ের গভীরে মিশে যেতে পারি
আমি এক উদ্ভিন্নযৌবনা তটিনী
প্রমত্ত সিন্ধুর বুকে ঠাঁই পেতে চাই
তারুণ্যের উল্লাসে পান করবো গণ্ডুষ গণ্ডুষ জল
আমি তৃষ্ণার্ত, আমি তৃষ্ণার্ত…

শংকরজ্যোতি দেব

হাওয়ার দিন

এমনিভাবে হুসহুস করে আমার দিনগুলো হাওয়া হয়ে যাচ্ছে
গেঁয়ো রাস্তাঘাট ছোটছোট জমিজমা অহরহ ডুবছে
শরীরের অতলঅবসাদে
যেতে যেতে তবু যেন আকাশের অসীম প্রাসাদে অসহায় নগ্ন হয়ে
ফুরিয়ে যায় গহনবনের কর্কশ কালো আশাঢাকা পথ
থমকে দেয় দূরপাথারের দাক্ষিণ্যের দিনগুলো
ছুটে যাওয়া হাওয়া সে হাওয়া নয়। হন্য হয়ে খুঁজেছি তাকে

সেই প্রবীণ পৃথিবী থেকে পথ বেয়ে উঠেছি
সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এসেছি আমার দিনের খুঁজে
তবু বারবার বেনাচির চূর্ণে অন্ধ হয়ে ফুরিয়ে যায়—ফুরিয়ে যায়

নচিকেতা ভরদ্বাজ

বিকেলের রঙ্

নরম বিকেল আজ সোনা রঙ্ গুগ্‌গুলের মত
সময়ের ধূপদানে পুড়ে যায়—গন্ধ ছড়ায়—
গভীর করুণ গন্ধ!—সমর্পিত রাত্রির কুয়াশা
এখনো অনেক দূরে, রুপালী নদীর মত স্নিগ্ধ পরিণত
নারীর নির্জন তনু—কুমারী-কামনা-প্রেম পুড়ে পুড়ে যায়।
পাপড়ির মতন ঝরে এক একটি বুকের উচ্ছাশা।

সময়ের অন্ধকার, রিক্ত রাত্রি,—এখনো দিগন্ত দূরে,
এখনো জীবন
অপার্থিব আলো নিয়ে হয়তো বা ফুটে উঠবে কমলের মত।
বহতা নদীর মত বড় সমুদ্রের দিকে জীবন যৌবন
আমাদের ধাবমান। কী আবেগে আকাঙ্ক্ষার জলে
তবুও সুস্নাত আমরা। ফলনম্র মুগ্ধ দিন কী সুখে নিয়ত
নিহিত শান্তির দিকে। বিবেকী এ আষাঢ় আসলে
মুক্তির প্রতীকে আনে বন্ধনের অমিত অব্যয়
শাশ্বত সূর্যের ব্যথা। দগ্ধতনু বিকেলের গন্ধে সমাকুল
আমার সত্তার সূর্য পরাজিত দেবতার কাছে।

সব গেলে তবু রাত্রি!—বলে, "আছে, আছে…
চন্দন-চিতার মত বিকেলের ম্লান রৌদ্রে অস্তিত্বের ফুল
ঝ'রে যায়—ম'রে যায়। ঊর্ধ্বমুখী অপ্সরা জানালা
তব জেনে তবু আজ কী যে মুগ্ধ মৌন মায়াবিনী,
বসে পূর্ণ রাত্রির পেয়ালা
এখনো অপেক্ষমান, আপন শবের গন্ধে রঙিলা স্বৈরিণী॥

সন্তোষকুমার মাজী

সাপ সংক্রান্ত

সাপটি এখন সম্বৎসরের হিসাব মেলাতে বসেছে ঃ
কয়টি ছোবলে সে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, ব্যূহকেন্দ্রিক
কয়টি ফোঁসফোঁস তর্জন গর্জনে লোপাট করেছে প্রতিবেশী ভাবনাকে
চ্যুতি ঘটেছে কখন, নিজেকে নিশ্চেষ্ট করেছে কতদিন
কিংবা বিরামহীন দহনে প্রজ্জ্বলিত কতটা দাহ্য হয়েছে সাময়িক

এই তোড়জোড়ের সময়ে পৃথিবী নড়ে উঠল ঘোরতর, অনিশ্চিত
দুর্যোগের ঝড়ঝাপটায় উড়িয়ে নিল ঘরবাড়ি ও কান্ডজ্ঞান

সতর্ক হতে গিয়েও সাপটি উদ্যত, চোখেমুখে নাবালক ও তীক্ষ্ণ

সে দেখল তার সাঙ্গপাঙ্গরা গুছিয়ে নিচ্ছে লটবহর, মাথার মণি, কেতন
আবহমান শিল্প, সংকেত, দলিল দস্তাবেজ ও আসবাব
সাপটি, দ্রুত, অন্ধকারে খুঁজে আনল, কালকূট, তুচ্ছ আয়ু ও
বিক্ষিপ্ত শব্দমালা
একটি বিচ্ছিন্ন করোটি এবং দক্ষতা---

মঞ্জুভাষ মিত্র

কল্পিত শহরে ব্যাধি নামে

—মালতীমালা তরুণীবালা কল্পনাময় শহরে এসে
ভুলতে পারি না তোমার কথা ও বসেছ আমার শরীর ঘেঁসে
হাসিমাখা মুখ দু হাজার নদী ত্বকের ফোয়ারা ঢালছে ঢেউ
মিলন নামক শহরের বুকে আজ রাতে জানি ঘুমোবে না কেউ
দূরে দেখা যায় লিবিডো পাহাড় হাড়ের মুকুট মাংসস্তূপ
হে লবনা নদী আমি বহমান দুটি হাতে পান করেছি রূপ
জানু সানুদেশে সারসের ভীড় নীচে নীল মাটি গায়িকা গ্রাম

সেই গ্রামে হায় ব্যাধির বীজাণু আজ রাতে এসে হানা দিলো
ভীষণ বিদায়! ভয়ার্ত হাত বিদায়বেলায় কুড়িয়ে নিলো
স্বপ্নের মাটি প্রণয়ের বীজ। দূর আঘাটায় কে যায় ভেসে
শ্বেতোপনিষদ তোমাকে ভুলি না কল্পনাময় শহরে এসে।

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

গাঙ্

বুকের ভেতরে কাটা দুটো গাঙ্
হৃদয়কে করে দিচ্ছে ফাঁক ও ফারাক
মাঝে মাঝে জলে তোলপাড় বুক
ঘাই মারছে জলের তুফান।

কার স্বপ্ন ভেসে যাচ্ছে? যুবতীর চুলের পাহাড়
ভেঙ্গে ভেঙ্গে হাওয়া ছুটছে আকাল মৌসুমী ঃ
একা চাষা শস্যের সবুজ ঘ্রাণ মেখে নিয়ে
টান টান বুকে ছুটছে শুনে নিচ্ছে জলের কল্লোল
জলের গোপন ভাষা চাষা বোঝে
গান ভাঁজে জলের নৌকায়।

কুমারী মেঘের বুকে দুধের মতন বৃষ্টি
জমা হয়, আষাঢ়ে দিনের ছায়া পড়ে
মমতা মেদুর হাওয়া অন্য দেহের গন্ধ বয়ে আনে
শরীরে আছড়ে পড়ে আরণ্যক রাত ঃ

নৌকোডুবির রোলে বুকের কল্লোলে গর্জে
দুই দিকে দুটো কালো গাঙ্।

ঈশ্বর দত্ত

ধনিয়াখালির দীঘিতে নির্জন সংলাপ

দেখা তো কিছুই হল না ;
এই কি সেই বিখ্যাত দীঘির পাড় ধনিয়াখালির
এখানে কি পরিশ্রান্ত পথচারীর দেহমন
শান্তিতে ঘুমোয় এতকাল !

বাঙলার ঠ্যাঙাড়েদের যতসব পুরাতন গল্প-ইতিহাস
মানুষের মুখে মুখে জীবন্ত হয়ে ওঠে রাত্রি দুপুরে
তখন দীঘির জল টলমল ছলছল
কালিঢালা কালো আর নয়
যেন সব লাল মৃত্যু ছোবল !

এখানে দাঁড়িয়ে একা শোনা যায় কলরব, অশ্রুপদাবলী ঃ
কোনো এক বামুনের একমাত্র বংশধর—নটবর নাম
সর্বস্ব দিয়েও তবু করুণা পেলো না কোনোমতে,
কারো হাতে
মুছে গেল স্বপ্ন তার, সূর্যও ওধারে মুখ লুকালো।

এমন তো অনেক কাহিনী ফেরে মুখে মুখে আজও প্রতিদিন
ধনিয়াখালির দীঘির তলে স্মৃতির প্রবাল জমে জমে
ক্রমশঃ কঠিন হয় সময়ের নির্বেদ নিয়মে ;
জলের রক্তিম ঢেউ
শান্ত স্বচ্ছ দীর্ঘ বিশ্রাম।

জেগে নেই পাখী কিংবা চলমান ছায়াগুলি, আর সেই
কালরাত্রি শিহরণ   অদ্ভুত আতঙ্ক···
গাঢ়তর অন্ধকার মুছে দেয় শুক্লা দ্বাদশীর
স্বৈরিণী চাঁদ
বনময় জ্যোৎস্না এখন······ ।

কমল তরফদার

হিমশৈল

এতটাই ভেসে থাকে অহং
কঠিন শৈত্যে ফাটল ধরে এখানে ওখানে
মনের দুর্বলতার ভিতর ভেসে থাকে
প্রচণ্ড স্পৃহা, যা উপরের দিকে চাপ দেয়,
ধ'রে রাখে পর্বত, এমন কি
বসুন্ধরাও।
পা টিপে টিপে এগোয় তার দিকে
সমুদ্রের ঢেউ
হিমশৈলর গায়ে সহস্র লাইন বানিয়ে
চুমু খায় এখানে ওখানে।
অহং ভাসতে থাকে অথৈ জলে
চারপাশে দিগন্ত দূরে দিগন্ত এবং
ঝকঝক করতে থাকে দর্পণ
অহংয়ের ভিতর জমাট বাঁধা উচ্ছ্বাসে
ছায়া পড়ে আনন্দশ্রীর
আবহাওয়ার বিন্দু বিন্দু জল
হিমশৈলর মুখ গড়িয়ে নামে
বেপথু প্রভাতে ভাষাহীন
সে কি শক্তিমান   সে কি লোভহীন ?

রমানাথ ভট্টাচার্য

এগিয়ে যাচ্ছি

কৃষ্ণচূড়া এগিয়ে যাচ্ছি তোমাকে পিছনে ফেলে
সামনে দাঁড়ানো গোলাপ-বাড়ি
গোলাপ-বাড়ি এগিয়ে যাচ্ছি তোমাকে পিছনে ফেলে।

সামনে দাঁড়ানো সবুজ নদী
সবুজ নদী এগিয়ে যাচ্ছি তোমাকে পিছনে ফেলে
সামনে দাঁড়ানো সুনীল দিন
সুনীল দিন হাত ধ'রে নাও।

মলয় সরকার

স্পষ্ট বলো

আড়ষ্টতা ভাঙো
এবার দু' হাত খোল, দেখাও ভেতরে কী
তুষ্ট হোক ক্ষুব্ধ পৃথিবী, নিরুদ্দিষ্ট মেঘমালা
গৃহমুখী হোক
স্পষ্ট বল
অনেক সময় তো নষ্ট হোল
এবার লজ্জা নিয়ে ঝরে যাবে ভোরের শিশির

তোমারও লজ্জা ভাঙো, স্পষ্ট বলো
দু'হাত মেলে দেখাও ভেতরে কী
সুযোগ দাও
এবার, মূল্যায়ন করে দেখি—
এতদিন লজ্জা নিয়ে বর্তে থেকে
কি হোল তোমার।

রবীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

বাসনার অপমৃত্যুতে

বাসনাগুলিকে সামনে রেখে আমি কেবল ভাবছি
কোন্‌টা ফুটবে, কোন্‌টা ঝরবে কিছুই ত জানা নেই।
ওগুলি দেখলে আমার বড়ই মায়া হয়—
কেমন ফ্যাকাসে রক্তহীন আমার মতন।
কত অসহায়, অনিশ্চিত ওদের জীবন।

আমার বাসনাগুলি, তোরা সব সাবধান।
উত্তুরে শুকনো হাওয়া আসছে। কেউ বাঁচবি না—
সাবধান!
এক-আধটা কুঁড়ি হয়ত ফুটবে, হয়ত বা না।
সব ঝরে যাবে, উড়ে যাবে।
আমার বাসনাগুলির সামনে আমি শুধু ভাবি:
ওগুলো কেন আসে? আবার কেনই বা ঝরে যায়?
ওদের অপমৃত্যুতে আমি বড় ব্যথা পাই।
এই অপমৃত্যু থেকে বাঁচাবার কোন বৈদ্য নেই?

বেণু দত্তরায়

স্বপ্নগুলি

বদমেজাজী স্বপ্নগুলিকে নিয়ে আর পারি না

স্বপ্নগুলি মাঝে মাঝে খুব প্রতারণা করে, খুবই
বেআকুফ, যে-ছকে সাজাই, খুব চোখ ভিরকুটি করে
সারারাত
গেলাশের কাচ ভেঙে বালিশের তুলো ছিটিয়ে
রেলিং টপকিয়ে অন্যের বাড়িতে ঢুঁ মারবার
খুবই বিপজ্জনক উত্তেজনা জড়ো হয়

অথচ ডাক্তারগুলিকে খুব বিশ্বাস করতে পারি না
গলায় স্টেথো ঝুলানো বিপদ,
সন্তোষজনক বুকের খবর নিতে অনেকেই জানে না

হ্যালো, ওয়ান-টু-থ্রি-থ্রি···হ্যালো অমুকবাবু,
নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন? দৈব ওষুধ বাতাতে পাবেন,
খাঁচাটা খালি যাচ্ছে, টুরিস্টদের এই স্বর্গ—

ভিড় একেবারে নেই, শুধু দামাল
পকেটমারগুলি চেঁচাচ্ছে—
আসুন স্যার, আসুন খাসা আমীরীচালে থাকবেন,
যে যেমনটি চান, যেমন-তেমন চাখবেন—

আসলে চাখবার কিছু নেই, নষ্টা ভ্রষ্টা মেয়েগুলির
চোখ উঠেছে, ঊরুস্তম্ভ বিপজ্জনক জল-ছাদ
স্বপ্নগুলির কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াই
স্বপ্নগুলি
খুবই গোত্তা-খাওয়া বাঘ অথবা বন্য মহিষ
রাইফেলের ট্রিগারে হাত ভয়ানক ভ্রূ-সন্ধি
উড়িয়ে দিতে সাধ হয় জন্ম-জন্ম
বিপজ্জনক স্বপ্নগুলিকে নিয়ে আর পারি না

হেমকুমার মুখোপাধ্যায়

স্মৃতি

জোছনার মত স্বচ্ছ নরম পালকের হাঁসেরা
হ্রদের গভীর থির জলে
নখে চিরে সাঁতার কাটে
উথাল পাথাল বুক ছিঁড়ে
যন্ত্রণার লালপদ্ম ফোটে···

আরশিতে ছায়া ভাঙে ঃ
আকাশ, তারার মুখ,
পরিচিত চাঁদের শরীর
ভেঙে ভেঙে একাকার হয়

ঘুমের ভেতরে
গুম্ গুম্ শব্দ তুলে
রেলগাড়ী ব্রিজ পার হয়।

সমাপ্ত প্রদোষে

কেউ তবু নষ্ট পুষ্ট অ-সুখকে
খেলার ভেতর পুষে রাখে,
চোখ পাল্টে যেন এক রঙ্গীন মাছরাঙ্গা পাখী
মায়াবী বুকের সন্নিকটে উড়ে উড়ে
সমাপ্ত প্রদোষে করে ছল, রাঙ্গা ঠোঁটে।
ইচ্ছে খুশী তুলে নিতে এলে
রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা—দান করে শেষমেষ
জন্মের সম্বল।

রাজকুমার বণিক

অবিচ্ছিন্ন উজ্জ্বল দিন

খেদ করে কোন ফল পাওয়া যাবে না।
ধুকপুক মনটাকে
শক্ত হাতে চেপে
পুরোদমে
স্বাচ্ছন্দ গতিবিধি নিতে হবে এবার।
ঘরে ঘরে
অল্প বিস্তর সজাগ থেকো।
মেঘমুক্ত সোনালী আকাশ
হাওয়া
অটুট ধরে রাখা চাই।
কিছুতেই এ উম্বাস্তু অসময়ে সময়
হাতছাড়া করব না।
সেই থেকে
এক নাগাড়ে তড়পাচ্ছি
কেননা
অবিচ্ছিন্ন উজ্জ্বল দিনটিকে
মানুষের জন্যে রেখে যাব বলে।

বাহিরেই থাকি

বাহিরেই থাকি ভিতরে আসি না আবশ্যিক ঠান্ডা থাকি, প্রাকৃতিক
আমার হাত ধরে এক পরিস্কৃত সরল কন্যা ফিরে আসে, জাঁকিয়ে থাকে
মায়ের ওম
তারপরেই অকারণে হাসি পায় বাইশ দুই বাহাত্তরের মেয়ে
আজ মেয়েমানুষ, পরের ঘরের লোক নিজস্ব পাশটি
দখল করে রাখে, অধিকারে, বাহিরের লুব্ধ চোখ আড়ষ্ট করার জন্য
(বস্তুতঃ স্বামী গেঁথে রাখে আমূল দৃষ্টিপাত)

মনে মনে প্রত্যাখ্যাত হই তিনবার
ফিরে আসার সময় দেখি একজোড়া নীলমণি ভেদ করে চামড়ার পিঠ
দীন বেশবাস
কবিতায় যার ঠুকড়েছে হাড় পাঁজর ঘুণ প্রত্যাখ্যাত বাসা
এহোবাহ্য তার হাসা তার ভালবাসা পুরোন নারীর জন্য
নিষিদ্ধ সুখের ছোঁয়াচ কখন তলপেটে চিনচিন করে
নিজস্ব ঠিকানা বড় ভুল হয় এ মুহূর্তে
চার বছর কতদিন জানি না
দামাল শিশু দালানে পদচিহ্ন চিনে বেছে নিতে পারে
নিজস্ব পিতার উরু

সন্ধিহীন একজোড়া চোখ ছাড়া অন্য কোথায় লুকোলে
প্রিয় নারী, জানি না জানি না জানি না বলে মনে মনে
অনুতাপ গুণগুণ করে ফিরে যায় অক্ষর ব্যবসায়ী

প্রিয় নারীর জন্য বাহিরেই থাকি
আবশ্যিক শীতল থাকি প্রাকৃতিক ।।

যাওয়া আসা

ভাবছি তুমি সরে গেছ
আসল কথা মরে গেছ
যা মরে তা আর ফেরে না
খুঁজতে যাওয়া ভুল ।
তবু কেন মিছে মিছে
যাওয়া আসার পিছে পিছে
কান্না ভাঙে কুল ।
সে যদি আর ফিরে আসে
ভালোবাসার এ বিশ্বাসে
দেখবে এসে আসন পাতা নেই
ধুলায় ভরা ঘরের মাঝে
আসরটি আর জমবে না যে
ভাঙবে সভা এ বৈঠকেই
একটুখানি রৌদ্র পাতে
শিশির যেমন শুখায় প্রাতে
থেমে যাবে বিরহ ক্রন্দন
নূতন দ্বীপের নূতন বনে
তাই গেছে সে অন্বেষণে
এখন কোথায় সাদর নিমন্ত্রণ—

কল্যাণ মহাপাত্র

ঈশ্বর নির্বিকার

তোমার সরল মুখের চেটোয়
তোমার নির্বিকার
তোমার অসামান্য সুন্দরতায়
ঈশ্বর ইচ্ছাচ্যুত

কেবল মোহিনী চোখে বিষ তীর দিয়ে
হৃদয় মাড়িয়ে ঈশ্বরী হয়ো না।

বেবাক বোখরায় ঋতুগুলি বক্ষচ্যুত হতে পারে
ঈর্ষায় নজর নিশ্চেষ্ট হলে
অম্লান ফুলে পাব না লাল রঙ
বিবর্ণে ভিত বড় আলগা হয়ে যায়
আড়ালী গোপনতায়॥

প্রভাতকুমার দাশ

সবুজ সংবাদ

রুক্ষ মাটি তবু তাকে যোগ্যতা দিয়েছো বনানীর
প্রকৃতি এখন তার স্তবগানে মুখরিত
এইখানে কিছুক্ষণ   ক্ষান্ত হোক উদ্ধত ব্যর্থতা

কথা ছিল তোমারও অঞ্জলি হবে আলোকিত
উন্মুখর পুষ্পের স্তবকে
রঙের উজ্জ্বল শব্দে স্বর হয়ে ঝরে পড়বে
নয়নাভিরাম প্রাণের উদ্ভাসে

স্পন্দমান

যাও তার হাওয়ায় সংবাদ দাও প্রাত্যহিক রৌদ্র ও বৃষ্টির
সবুজ নিয়েছে তার যাবতীয় কলরোল ম্লান রুক্ষ বর্বর মাটির
এখন প্রার্থনা কর তোমারও অঞ্জলি যেন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে
সবুজ উৎসবে

কবিরুল ইসলাম

বর্ণ পরিচয়

গাছ কিছু-কিছু চিনি, আরও বেশি ফুল চিনি
আমারই স্বভাবে :
কি ভাবে কখন কোন্ গাছ বাড়ে
ফোটে কোন্ ফুল
তাও একটু-আধটু চিনি, তাদের স্বভাবে
যেন বালকের হাতে-খড়ি বর্ণ-পরিচয়ে
এই শুরু। এই ভাবে শুরু॥

প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ

কালপুরুষ

আলখাল্লার ফুলে জড়ানো এক দীর্ঘকায় পুরুষ
ঊষাকে বামে ও দক্ষিণে দুভাগ করে' হেঁটে যাচ্ছে,
মাঠের আল কাঁপছে অশরীরি শব্দে,
চাকায় চাকায় বিলীয়মান শব্দে কি এক অজানার রেশ,
নারীর শ্রোণীদেশের মতো সুবর্ণরেখা
মন্থর চালে জল নিয়ে খেলতে খেলতে চলেছে
পাথরে আওয়াজ তুলে—
আহা পাথর, আমার আশৈশব দুঃখের খঞ্জনী
বাজিয়ে কোথায় চলেছ—
আহা পাথর, আমার অনাগত অবশ্যম্ভাবী
সুখের নিক্কণ তুলে কোথায় চলেছ—
ঋজুদেহী পুরুষের কপালে বলীরেখায় মানচিত্রে ক্রমশঃ জটিল
রহস্যা রমণী কেন পিছু নাও আমার,
আমি চলেছি এক অন্তিম কাঠুরিয়া,
ফিরে যাও, আমি যাই প্রত্যাবর্তন হীনতায়

কুট ঝাঁঝি জালে আচ্ছন্ন আমার এই শরীর
প্রেতায়িত সম্প্রীতিশূন্য, অথচ প্রেমময়
গাছের বাহুতে জড়ানো চাঁদ ক্রমশ দীর্ঘতা
ধারণ করছে, যা ঐ ঋজু মানুষের সমতুল।

সন্তোষকুমার অধিকারী

মাঝে মাঝে এ হৃদয়

মাঝে মাঝে এ হৃদয় ঘৃণায় বিদীর্ণ হতে চায়
রক্তের তরঙ্গে জাগে দোলা,
চোখে বেদনার নীল প্রচণ্ড উত্তাপ ;
অগ্নির দাহনে মৃত্যু—তাই আকাঙ্ক্ষিত।

স্তবকে স্তবকে শুভ্র কুসুমের দলিত দলের
ক্লেদ এই বুকের পাঁজরে।
পায়ে বেঁধা ক্লান্তির হতাশা অবারিত,
অনেক স্বপ্নের শব ছিন্নভিন্ন
ছড়ানো পাহাড়ে।

উঠেছি অনেক দূর দুর্গম শিখরে,
দুহাতে জয়ের তূর্য—
অথচ প্রবল
ঘৃণায় হৃদয় তবু চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যেতে চায়।

ওয়াজেদ আলি

বৃষ্টির ফোঁটার মতো

বৃষ্টির ফোঁটার মতো চোখ ছিল বুকে
বুকের অরণ্য জুড়ে ভালোবাসা ছিল
আর সেই প্রিয় নদী অরণ্য-সন্ধ্যায়
শব্দপাখি মন ছুঁয়ে ডেকে যেত দূরে

তবু সে স্মৃতির চরে ব্যথাতুর আমি
তোমার মনের কাছে হলুদ চেয়েছি
আর সেই প্রিয়ফুল বুকের বোঁটায়
ছায়াছায়া কবিতার শিশির এঁকেছি

তাই এই মৌনমনে স্মৃতির উদ্যানে
তুমি এক ভালবাসা শব্দময়ী নারী

শিশির ভট্টাচার্য

ওরা

[সুভাষ চট্টোপাধ্যায়-কে মনে রেখে]

ধাঁধায় বিষম ধাঁধায়
কাঁদায় ওরা হাসায়
কঠিন রাতে ভীষণ পাহাড়
বুকের গভীর ভাসায়।
নীল আকাশে মেঘের মাতাল
যেভাবে ঢল নামায়
কিংবা যেমন অশ্রুধারা
দুঃখ গহীন থামায়।
তেমনিভাবেই শুকনো পাতা
সবল হাওয়ার সাড়ায়
মনের ভেতর কাঁপন তোলে
কখন মুক্ত ধারায়।
কোথায় যেন কখন
অদেখা এক অচেনা এক
ভাবায় গভীর ভাবায়
এবং কখন কাঁদায়
নীল আকাশে মেঘের মাতাল
যেভাবে ঢল নামায়
এবং কখন ভাসায়।

বিদেশী কবিতা ঃ

আফ্রিকা

কবি আর্ডনার

[আধুনিক আফ্রিকান কাব্য-আন্দোলনের স্রষ্টা ঘানার তরুণ কবি জর্জ আর্ডনার উইলিয়ামসের জন্ম সমুদ্র তীরবর্তী কেটা প্রদেশে। উচ্চ-শিক্ষিত এই কবির রচনায় প্রাচীন লোকগাথার পাশে শহর-জীবন পাশাপাশি চিত্রায়িত। ভাষার বাঁধন এবং স্টাইলের জন্য বিখ্যাত। জন্ম ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে। তিনি 'The Spokeman' নামক এক ইংরেজী সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক। সাহিত্য-জগতে কফি আর্ডনার নামেই পরিচিত। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'Rediscovery' ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত। তাঁর লেখা ছোট গল্প ও উপন্যাসের সংখ্যা ১২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট-বৃটেনসহ বিভিন্ন দেশে তিনি আফ্রিকান সাহিত্যের উপর আলোচনায় যোগ দিয়েছেন।]

প্রেমিকের গান

ওকে ডাকো, ওকে ডাকো, ওই মেয়েটিকেই আমার প্রয়োজন,
মেয়েটির উদ্ধত গ্রীবা যেন মরুভূমির বুকে গর্বিত বৃক্ষ,
ওকে ডাকো, সে এবং আমি দুজনে এক বিছানায় ঘুমুবো,
তুমি যখন এখান থেকে চলে যাও, বোধ হয় দূরত্বের সাত বছর
আমি কি নিজের ভাঁজ খুলে দিতে পারি ? আমি কি সত্যি মূল্যহীন ?
বাজারে যে মাল-বিক্রী হয় না, তার চেয়েও কি বিবর্ণ ?
দোকানীরা মেয়েমানুষ বিয়ে করে বটে কিন্তু নায়িকার
পাশে ঘুম আসে না,
সাত-সাতটা বছর কোথায় হারালো ? এই সাত বছর
তুমি কোথায় ছিলে ?

অনুবাদ ঃ অমিতাভ চক্রবর্তী

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে ঃ

ইংরাজী

শ্রীঅরবিন্দ

[শ্রীঅরবিন্দ রচিত The Trimuph-song of Trishuncou কবিতার বঙ্গানুবাদ]

ত্রিশংকুর বিজয়গাথা

মৃত্যু আমার নেই···
বন্ধ খাঁচায় অন্তরাত্মা যখন পড়বে অবসন্ন হয়ে
তখন এই দেহখানি যোগাবে অগ্নির আহার্য
আমার গৃহ যাবে দগ্ধ হয়ে—আমি নয়···

খাঁচা ত্যাগ করে
আমি খুঁজে পাব প্রশস্ত এক অতি সূক্ষ্ম ঘর···
আত্মা আমার ক্ষুধার্ত কবর থেকে দূরে সরে দাঁড়াবে
মৃত্যুর আলিঙ্গনকেও করবে বঞ্চনা···

রাত্রি তার হিমশীতল বক্ষে
সূর্যকে করবে ধারণ, সময়ের হ'বে অবসান···
যে তারার দল, আক্রোশে জ্বলেছিল তারাও পাবে মুক্তি—
আমার ইতি নেই, আমি চিরকাল থাকবো···

পৃথিবীর মাটিতে প্রথম বীজ বপনের আগে
তখনও ছিলাম প্রাচীন বৃদ্ধ—
যে সব গ্রহনক্ষত্র জন্মগ্রহণ করেনি, তারাও শীতল হয়ে যাবে একদিন
তবুও আমার ইতিহাস এগিয়ে চলবে সম্মুখপানে···

নক্ষত্রের বুকে আমি আলো,
সিংহের পরাক্রম আর প্রভাতের আনন্দ···
আমি মানুষ···কুমারী···আমিই বালক···
পরিবর্তনশীল আমি, আমি এই অসীম বিশ্বরূপ···
আমি একটি বৃক্ষ
নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে রয়েছি অনন্ত নীলিমার কোলে···

নীরবে পতিত এক শিশিরকণা আমি
আর আমিই তো ঐ অতল অথৈ বারিধি…

আমি এই আকাশ
আর পরিপূর্ণ বসুন্ধরাকে একই সঙ্গে ধারণ করে আছি…
জন্মাবধি আমি ছিলাম শাশ্বত মনীষী
আর চিরকাল তাই থাকবো, যদিও আমি দেহত্যাগ করি……

অনুবাদ : কানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

হিন্দী

রবীন্দ্র ভারতী

[তরুণ কবি রবীন্দ্র ভারতী ১৯৭৪-এ বিহার আন্দোলনে চৌমাথায় কবিতা পাঠ করতেন। ১৯৭৫-এ 'আম আদমী কা স্বপ্ন' কবিতা প্রকাশিত হবার পর ওঁকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এক বছর পর্যন্ত জেলে ছিলেন।
দুটো কবিতা সংকলন 'ঋতুয়োঁ কী শহর', 'গিলী আঁখে মেঁ' এবং 'বকুল বড়া হো গয়া' একটি গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত। রবীন্দ্র ভারতীর কবিতা ও গল্পের উপজীব সাধারণ মানুষ, সুখ, দুঃখ খাঁটি ভালোবাসা থাকে।]

মানুষ

ফিরে আসে অরণ্য
ফিরে আসে নদীরা
বজ্রপাতের মত শব্দ করে আকাশ
উঠে আসে নেমে যায়
মস্তিষ্কে
বাসায়
পথে
সারাটা দিন কেঁপে চলে বেতের মতন
বেজেই চলে
যখনই তোমার
গ্রামের যে কোন কেউ এইখানে দেখা দিয়ে যায়।

অনুবাদ : বিশ্বজিৎ সেন

বাঁকুড়া

আনন্দ বাগচী—পঞ্চাশের অন্যতম প্রধান কবি। সম্প্রতি উল্টোরথ পুরস্কারে সম্মানিত। নতুন কবিতার বই বেরুলো 'উজ্জ্বল ছুরির নীচে'। কবিতা ছাড়া গল্প উপন্যাস ও শিশুসাহিত্যে আনন্দবাবুর অবদান স্মরণীয়। বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজে বাংলা পড়ান। থাকেন প্রতাপবাগান, বাঁকুড়া।

চারণ কবি বৈদ্যনাথ—এই মানবতাবাদী ঈশ্বরপ্রেমিক কবি হৃদয়ের ফল্গুধারায় স্নান সেরে তারাপীঠের পুণ্যতীর্থে হারিয়ে যান তন্ত্রসিদ্ধ যোগীদের ভীড়ে। তাঁর অন্তরসত্তা কখনো অতি রোমাণ্টিক আবার কখনো আগ্নেয় লাভার মত দুরন্ত দুর্বার…তাই জনগণের প্রিয় কবি হিসাবে তাঁর নাম দিগন্ত বিস্তৃত। নতুন কবিতার বই 'বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস ইত্যাদি' বেরিয়েছে এবং 'রূপশালি মেয়ে' (যন্ত্রস্থ)। থাকেন কৃষ্ণগঞ্জ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

শান্তি সিংহ—এই মিষ্টি মানুষটি প্রথম আলাপেই নিজের করে নেন সকলকেই। কবির চিত্র কল্পে যেন তুলি দিয়ে আঁকেন প্রচ্ছদ। প্রথম কবিতার বই—'লাল মাটি নীল অরণ্য।' এখন থাকেন পুরুলিয়ায়।

রাজকল্যাণ চেল—আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারে এঁর লেখা তরোয়ালের মতো মসৃণ। থাকেন—বেলবনী, ধমনী, বাঁকুড়া।

তুলসী চট্টোপাধ্যায়—'বিংশ শতক' পত্রিকার সম্পাদিকা। বাঁকুড়া জেলার একমাত্র মহিলা কবি। লেখার মধ্যে আন্তরিকতা আছে। থাকেন—পোঁকাবাঁধ উত্তরপাড়, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

জয়ন্ত সাহা—বাঁকুড়ার সব থেকে কনিষ্ঠ কবি। লেখার সরলতায় কৈশোরের ছাপ। সম্পাদিত পত্রিকা কস্তুরী। কাব্যগ্রন্থ 'ব্যক্তিগত সংলাপ' ও 'কেন্দ্র বিন্দু থেকে দূরে'। থাকেন—স্কুল ডাঙ্গা, বাঁকুড়া।

সত্যসাধন চেল—কবিতা লেখেন, ছবিও আঁকেন। সম্পাদিত পত্রিকা সংতর্ষী। থাকেন—বেলবনী, ধবনী, বাঁকুড়া।

বিনয় মিশ্র—লেখার মধ্যে কঠোর বাস্তবের ছবি পরিস্ফুটিত। কম লেখেন। সম্পাদিত পত্রিকা—'টেরাকোটা'। বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজে অধ্যাপনা করেন। থাকেন—লাল বাঁধ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

হরিদাস আচার্য—মূলতঃ গদ্যকার। ঋজু বক্তব্যের কবিতা মাঝে মধ্যে চোখে পড়ে। লেখেন কম। বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজের অধ্যাপক। থাকেন—স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া।

রমাপ্রসাদ পাত্রকর্মকার—নাটক অভিনয়ে উৎসাহী। বিনয়ী ও মিতবাক। কবিতায় সহজ সরল বেদনার্তি আছে। 'পথের সংগ্রহ' পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজে অধ্যাপনা করেন। থাকেন—রামপুর, বাঁকুড়া।

তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়—'সমন্বয় পত্রিকার সম্পাদনা করেন। কবিতা লেখেন।

কল্যাণ মহাপাত্র—বাঁকুড়ায় যে ক'জন তরুণ কবি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম। আগে 'মৌসুম' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। বিভিন্ন লিট্‌ল ম্যাগাজিনে কবিতা লিখে থাকেন। কাজের জন্য খড়গপুরে থাকতে হয়।

ঈশ্বর ত্রিপাঠী—অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের এই কবির কবিতায় একটি আশ্চর্য সুর বহুক্ষণ কানে বাজে। পাক্ষিক গদ্যের কাগজ 'দৃষ্টিকোণ' সম্পাদনা করেন। কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে 'বিপন্ন বিস্ময়' 'একজন গ্রাম্য কবি' এবং দ্বৈতভাবে 'ভালোবাসার অভিমানে'। বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজে অধ্যাপনা করেন। থাকেন—স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া।

রূপাই সামান্ত—কবি, প্রাবন্ধিক ও সমালোচক হিসাবে খ্যাতি আছে। অনেকগুলি কবিতার বইয়ের মধ্যে 'ঘরে ভালোবাসার পাখী' এবং প্রবন্ধ পুস্তক 'জীবনানন্দ প্রতিভা' বারংবার পড়ার মতো। বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজের অধ্যাপক। থাকেন—স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া।

রবি গঙ্গোপাধ্যায়—ছিপছিপে ধরনের এই নিরহংকারী মানুষটি বাংলা কবিতার জগতে যথেষ্ট পরিচিত। ইদানিং লেখেন কম। যুগ্ম কবিতা সংকলন 'ভালোবাসার অভিমানে' বেরিয়েছে। থাকেন নতুন চটি বাঁকুড়া।

শান্তি রায়—এই লেখক অজস্র পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। কবিতায় রূপকল্পতা লক্ষণীয়। প্রকাশিত হয়েছে 'মৌসুমী' এবং যুগ্ম কাব্য সংকলন 'স্মৃতি সান্তনা ও অভিষ্ট সংলাপ'। থাকেন—হিজলডিহা, বাঁকুড়া।

অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়—নির্জনতাপ্রিয় শান্ত স্বভাবের এই তরুণ কবি দীর্ঘদিন লিখছেন বহু পত্রিকায়। কবিতার বই—'সুখের নাম অসুখ' সম্পাদিত পত্রিকা 'দহন'। থাকেন—নতুনচটি, বাঁকুড়া।

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়—সম্ভাবনাময় এই তরুণ কবির কবিতায় জীবন-যন্ত্রণা আছে সমাজ সচেতনতা ও ক্ষোভ আছে। কবিতাকে হৃদয়মুখী শিল্পস্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যত্নবান। অজস্র কাগজে নিয়মিত লিখছেন। 'সোপান' সাহিত্য পত্রের সম্পাদক। কবিতার বই বেরুচ্ছে—'আদিবাসী গ্রামের মাদল'। থাকেন—কৃষ্ণগঞ্জ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

মৃতুল মুখোপাধ্যায়—'ভেলা' পত্রিকা সম্পাদনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যচর্চা করেন। স্কুলের শিক্ষক। থাকেন—ছাতনা, বাঁকুড়া।

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত—প্রগতিশীল চিন্তাধারার উপরে লেখা এঁর প্রতিটি কবিতায় হৃদয়ে স্পর্ধা যোগায়। সম্পাদিত সংকলন 'মুক্ত কবিতার মুখ', কাব্যগ্রন্থ 'রণমুখী রক্তের ভিতর'। থাকেন—তিলুড়ী, বাঁকুড়া।

এ ছাড়া হীরেন পাল, সুভাষ মন্ডল, আশিষ রায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায় রঞ্জিত শর্মা, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ মহাপাত্র, নয়নতারা দে, তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর গাঙ্গুলী, মোহন সিংহ, স্বপন দত্ত, মাণিক চৌধুরী, শিবদাস চট্টোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন উপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, নিতাই নাগ প্রমুখদের লেখা বাঁকুড়ার পত্র পত্রিকায় কচিৎ কখনো চোখে পড়ে।

কবি শান্তনু দাস প্রস্তাবনায় লিখেছেন ঋজুতম বিশ্বাস, চেতনা, প্রেম, প্রীতি, যন্ত্রণা, সব কিছু জং ধরে বেসুরো হয়ে বাজছে, যেন এটাই সুর। কে যেন এই ভগ্নস্তূপের উপরে নটরাজ হয়ে দাঁড়ালো। কে এই মানুষ? সবাই হাত নেড়ে বলছে—না, তুমি নিয়মের বাইরে। তোমার পায়ের ঘায়ে আমার পবিত্র যজ্ঞের স্থণ্ডিল ছত্রাকার। তুমি—কাফের, তুমি নির্বাসিত। সেই নির্বাসনের অন্ধকার থেকে আমার কাফের কোনো বিশেষ ধর্মে বিশ্বাসী নয়, হয়তো-বা সে কখনো নাস্তিকও। যে দু'মুঠোয় আকাশকে টেনে এনে দু'পায়ের পাতায় সূর্যকে মাড়িয়ে, নিবিড় নীলিমাময়ী পৃথিবীর কাছে নতজানু। সে একক, স্বতন্ত্র, বেমক্কা এক বেয়াকুফ।......

এখন দেখতে হবে কবির এই অকপট স্বীকারোক্তি কতখানি চিত্রিত হয়েছে। 'কাফের' শব্দটি সাধারণতঃ এক ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে ছোট দেখাবার জন্য ব্যবহার করা হত। কারণ নিজের ধর্ম নয় বলেই সে বেয়াকুফ, মানে কাফের। অচ্ছ্যুৎ সে নিয়ম কানুন মানে না। সে নিয়মের বাইরে মুসাফির। কিন্তু নিয়মের বাইরেও নিয়ম আছে, বিশ্বাসের উপর বিশ্বাস, সে প্রকৃতিকে ভালবাসে। দোয়েল ডাকা সকাল। ঘুঘু ডাকা দুপুর। বন্যার নদী। শীতের পাহাড়। এইসব দৃশ্য সে ভালবাসে। তাদের সঙ্গে ঘর করতে ভালবাসে। সে মানুষের ঘর ছেড়ে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নেয়।

শান্তনু দাসের 'কাফের' পড়তে গিয়ে এই ব্যাপারগুলো চমৎকারভাবে চোখে ধরা দেয়। আমার ঘরমুখো মন বাউল হয়ে যায়। আমি কবির সংগে বেরিয়ে গিয়ে কাফেরের সংগে মিশে আমার প্রেম, প্রীতি, যন্ত্রণা ছত্রখান হয়ে গিয়ে অন্য ভুবনে চলে যায়, যে চাতালে কাফের ঘুরে বেড়ায়। আমি মনে মনে বলছি। সেই পাপ কাঁধে নিয়ে আমি একা চলেছি কাফের, ভেঙে দিয়ে ঘর।··· ···আমি সেই ধর্ম সনাতন। দু'পায়ে মাড়িয়ে আজ এসেছি জঙ্গলে।···

আমি ভবঘুরে—আমি কাফের। পিছনে তাকিয়ে বলছি। কেন পিছু ডাকো? চিনি নাকো এ মাটির রূপ-গন্ধ-স্বাদ। অথচ আমার অন্বেষণ চলছে—কেন জন্ম? কেন মৃত্যু? কেন আমি? কেন বা কাফের। কেনবা কোষের ভেতরে রাখা প্রাণ। যাকে আমি করেছি লালন।···

এই পৃথিবীতে কেবলই যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার ডুগডুগি নিয়ে আমি তো বাউল হয়ে যাই। সুতরাং ফিরে যাও জননী আমার। কেননা এই দীর্ঘ নিদাঘের খোড়ো জমি ফুঁড়ে আমি হয়েছি পলাশ। কখনো আবার আমি থাকি ঘুমে/হাজার বছর ধ'রে ধান, যব,/গোধুমের ক্ষেতে দামাল শিশুর মতো যোজন যোজন মাইল পার হয়ে যায়/ছয় ঋতু।···

'কাফের' শান্তনু দাসের একটি দীর্ঘ কবিতার নাম। প্রস্তাবনায় শান্তনু দাস যে কথা বলেছেন তা তিনি রাখতে পেরেছেন পরম বিশ্বাসে। শব্দ চয়ন অতি মনোরম। যেমন গোধুমের ক্ষেতে। ছাওয়াল। ডালিম-আকাশে। হিলহিলে জিভের ডগায়। ফলুই মাছের মতো ফ্যাস ফেসে। শোণিত-সাটিন। হাঁটুটা পাঁজরে রেখে—লোহা তাতে। তল্লা বাঁশের মতো ক্ষুধার আগুনে মোড়া মানুষের হৃদপিণ্ড পোড়ানো। যুদ্ধ মানে—আরেক উৎসব। প্রতিদিন বীজ হয়, বীর্য খোঁজে রণ। এই রকম শব্দ প্রতিটি পাতায় যা মনকে নাড়া দেয়, গভীরে নিয়ে যায়। 'কাফেরে' আরো কিছু কবিতা সংযোজন করা হয়েছে। আসলে এক মলাটের ভিতরে অন্য কবিতা না থাকলেই ভাল হত। বরং 'কাফেরের জমিন আরো দীর্ঘ হলে আমার মনে হয় পাঠক আরো কিছুক্ষণ কাফেরের সঙ্গে থাকতে পারতেন কেননা পড়ার পর মনে হয়েছে 'কাফেরের' কথাবার্তা এরই মধ্যেই শেষ হয়ে গেল।

—জীবন সরকার

কাফের/শান্তনু দাস দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা—৯। দাম: চার টাকা।

২

মোট তেত্রিশখানি কবিতার ফুল গেঁথে গেঁথে "নষ্ট অরণ্যে ইউক্যালিপটাস" একটি কবিতার বই আর থাকতে পারেনি, হয়ে গেছে সু-চয়নিত একটি মালা। অথবা অন্যভাবে বলা যেতে পারে: কবি সৈয়দ কওসর জামাল তাঁর এক-একটি কবিতার পাপড়ির সাহায্যে শেষ পর্যন্ত একটি ঘুমন্ত কুঁড়িকে সদাফোটা শতদলে পরিণত করেছেন।

তাঁর লেখনীর সহজ পরিবেশনার ভঙ্গিমাটি অনবদ্য। সহজকে সহজভাবে প্রকাশ করার মত কঠিন আর্ট-কে তিনি ভালোই রপ্ত করেছেন। দুই চোখের সাদামাটা দেখার কথা যখন তিনি বলেন:

"অনেক ছবি ভেসে যাচ্ছে ট্রেনের জানলায়/একটু বাড়িয়ে বলছি না আমি, দ্যাখো—ঠিক সিনেমার পর্দা ঝুলছে সামনে। তোমার" [সবকিছুর আড়ালে] —তখন মনে হয় ঠিক এভাবেই তো আমরা সব ঘটনা দেখি জীবন-নামের রেল-গাড়ির খোলা জানলা থেকে।

আবার শিল্প যে জীবনের অন্তস্থলের প্রতিচ্ছবি সেই গভীর জীবনবোধ কবির কতটা পরিণত তা বোঝা যায় যখন তিনি জীবনের অন্যকথার মাঝখানেই শিল্প-কে টেনে এনে বলেন : "এটা আসলে একটা শিল্প—অন্যান্য শিল্পেরই মতো/যা সর্বদাই একই ভাবে থাকে" [সবকিছুর আড়ালে]/কিংবা, "শিল্পের মুখ চেয়ে অমরতা থমকে যায়" [বিস্ময়, শিল্পের]।

যদিও কবির লেখনীর মুখ্য বিষয় "প্রকৃতি" [বইটির নামকরণ আর প্রচ্ছদ অংকনের মধ্যেই এর পরিচয় মিলবে] তবু একেক সময় আশ্চর্যভাবে মানবমনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন : "সেই কোন কাল থেকে কবিতার বিষয় হয়ে আছো ; তুমি মানুষ/নিসর্গের পরিব্যাপ্ত উপকরণ ব্যবহারে এনে/তুমিই স্রষ্টা হয়েছো শিল্পের" [মানুষ নৈসর্গিক শিল্পকলা]।

আস্তে আস্তে কবিমন ঝুঁকে পড়ে মানুষের দিকে, ক্রমশঃ প্রকৃতির দ্বিতীয় সত্ত্বা "নারী"-র দিকে। বলেন : "অপনা নারী, তোমার কাব্যের উচ্ছলতা ছুঁয়ে থাক / তৃষ্ণার্ত এই বুকের আবেগ" (স্বপ্নপ্রতিমাসু)।

ক্রমশঃ গভীর হয় হৃদয়ের একান্ত অভীপ্সা। মানসসঙ্গিনী হয়ে যায় বাস্তব সঙ্গিনী। একসাথে দিন কাটে সীমান্ত শহরে "তোমাদের ছোট্ট শহরটি সেবার টের পেয়েছিল আমাদের উপস্থিতি" [সীমান্ত শহর], অতঃপর জমাট বাঁধে হৃদয়ের তরল উচ্ছ্বাস—"উচ্ছ্বসিত মুখ ছুঁয়েছে ভালোবাসা আমাদের / বুকের ভেতর থেকে রোদ্দুর লাফিয়ে নেমেছে" [সীমান্ত শহর]। হৃদয়ের টানে পুরনো আনন্দ-অভিজ্ঞতার মুখ চেয়ে কবিকে বলতে হয়—"এভাবে পুনরায় তোমার আন্তরিক হাত রাখে যদি প্রস্তাব/বাতাসের কাছে, শহরতলীর ট্রেন পুনরায় ছুটে যাবে সীমান্ত শহরে"।

কিন্তু এসকেপিজমের রোগ কবির মনে বাসা বাঁধতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত জীবনের উত্তাপের মাঝেই আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন তিনি। বলেছেন : আমাদের সব দুর্বলতা কাচের ঘরের মতো ভেঙে যাবে দুদ্দাড়। সারারাত উৎসব আয়োজন হবে" [মচ্ছব]। জীবনকে ভালোবেসে বলেছেন : "জীবনকে ভালোবাসি বলে ভুলে যেতে পারি তোমাদের সব মূর্খতা। তোমাদের ভালোবাসি বলে এভাবেই বাড়িয়ে দিচ্ছি আন্তরিক হাত" [স্বপ্নের পূর্ণতা]।

পরিশেষে কয়েকটি কথা অবশ্যই বলা প্রয়োজন। কালানুক্রম রক্ষা না করার ফলে Developement অর্থাৎ ক্রমাগ্রতির ব্যাপারটা বোঝা গেল না। কবি কল্পনা যতটা বিমূর্ত শিল্পকলার পেছনে ছুটেছে ঠিক ততখানি কাজ করেনি শিল্পের সাথে জীবনের সম্পর্কোদ্ধারে। —পার্থ মুখোপাধ্যায়

নষ্ট অরণ্যে ইউক্যালিপটাস—সৈয়দ কওসর জামাল। কলিকাতা—১৫

৩

সময়কে বাদ দিয়ে যেমন জীবনের কথা ভাবা যায় না, জীবনকে বাদ দিয়ে তেমনি কবিতার জন্মকে স্বীকার করা যায় না। সময় আবহাওয়ার পরিমাপের মত স্থির থাকে না। কালযাত্রায় দেশ ও দশের নানান সময়ের বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কবিরা সুখ-দুঃখ ও নীরব যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কবিতার জন্ম দেন। যিনি মনের কথা সরল রেখার মত বলতে পারেন, বোঝাতে পারেন সেই কবিই অধিকসংখ্যক পাঠকের অন্তরে সহজেই প্রবেশ লাভ করেন। তরুণ কবি ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায় এই পথে উত্তীর্ণ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নিঃশব্দের আর্তনাদ' যুগযন্ত্রণার বহ্নিপ্রকাশ।

প্রেমে বিরহ ও স্বদেশ জটিলতা ; এই নিয়েই তাঁর দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব। অনির্দিষ্ট পথে চলার জন্য তিনি সতর্ক নন। মনে হয় ফসলকে সরাসরি ঘরে তোলাই তাঁর ইচ্ছা। সেই সংগে শব্দকেও বিলাস বলে মনে করে ভাবের রাজ্যে নিজেকে নির্বাসিত করেছেন। এর ফলে অনেক শব্দ বার বার ফিরে ফিরে এসেছে।

স্বদেশ, মানুষ, পুরুষ, নারী, প্রেম, পৃথিবী, কবি ও কবিতা, মৃত্যু, বিরহ ইত্যাদি সবকিছুকেই ইন্দ্রনীল স্পর্শ করেছেন। এ ছাড়াও উনিশশো একাত্তর থেকে সাতাত্তরের দেশের সঙ্কটময় অবস্থাও তাঁকে বিচলিত করেছে। দেশের এই মাৎস্যন্যায় অবস্থায় তিনি কখনও চিন্তামগ্ন, কখনও ক্ষিপ্ত আবার কখনও হতাশ। তাঁর কাছে 'বিশ্বাস এ বিশ্ব-সংসারে যেন বিস্ময় ব্যথা।' —এইসব মিলিয়েই তাঁর কাব্যের আকর্ষণ।

ইন্দ্রনীল ব্যবহৃত—'কপালে সিঁদুর টিপ লাল পেড়ে শাড়ী', 'হেমন্তের মাঠ……কেঁদে ছিলো,' 'জীবন দেবতা', 'প্রিয়তমাসু' ইত্যাদি অংশগুলো একদিকে যেমন আমাদের অতি পরিচিত ; অন্যদিকে 'বিষণ্ণ বাঘ,' 'বিষণ্ণ শিশু' 'বন্দী বৃশ্চিক যেন শিশির ভেতর নিজেই কামড়ে ধরে নিজস্ব অস্তিত্ব' ইত্যাদি অংশগুলোর সঙ্গে তেমনি পরিচয় ঘটে।

—অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়

নিঃশব্দের আর্তনাদ—ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়। দেউটি প্রকাশনী। হিজলপুকুর, হাবড়া, ২৪ পরগণা। দাম : পাঁচ টাকা।

৮ই ফাল্গুন

আমার ভাষা, তোমার ভাষা, আ মরি, বাংলা ভাষা। এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ওপার বাংলার কয়েকজন তরুণ মাতৃভাষাকে ভালবাসার জন্য শহীদ হয়েছিলেন। তাদের স্মরণ করবার জন্য এপার বাংলার ত্রিসপ্তক গোষ্ঠীর কবিতা পাঠের আয়োজন করেছিলেন—১৪/১ বি বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিলেন ঋষিণ মিত্র। ভারি সুন্দর অনুষ্ঠান। কবিতা ও কবিতার গান। কবিতার গীতিরূপ পরিবেশন করেছিলেন ঋষিণ সরকার, কার্তিক মোদক।

মিত্র ও অন্যান্যরা।

বনফুল

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কমলকুমার মজুমদার

বিষ্ণু চক্রবর্তী

With best Compliments from :

DIWAKAR ENGINEERS LIMITED

Works : B-65/1
Wazirpur Industrial Area
Delhi : 110052
Phone : 743711

Regd. Office :
1/5-B, Asaf Ali Road
New Delhi-110002. India
Phones : 265916 267611
Grams : TUBESHELL
Telex : 31-3626 SUN IN

Branch Office :
KANAK BUILDING
41, Chowranghee Road, Calcutta-700016
Phones : 244874 240802
Telex : CA-2763

Manufacturers of :
Steel Tubes & Pipes, Tube Mills & Exporters.
Also Merchants Exporters / one of the Leading Merchant Exporters.

From

A well Wisher

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপি সব ঘরে ঘরে।
রাখিবে তণ্ডুল তাহে এক মুষ্টি করে॥
সঞ্চয়ের পন্থা ইহা জানিবে সকলে।
অসময়ে উপকার পাবে এর ফলে॥
॥ ব্রতকথা ॥

টাকা জমানোর পন্থও একটাই—একমুঠো চালের মত, নিয়মিত যত টাকা সম্ভব ইউবিআইতে রাখা। ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয় সংসারে চিরকাল লক্ষ্মীশ্রী বজায় রাখবে। ইউবিআইতে টাকাটা নিরাপদ থাকবে, সুদে বাড়বে আর তোলাও বেশ সুবিধেজনক।

ইউবিআই আপনার শুভার্থী প্রতিবেশী।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

Best wishes from :

NATAGARH BRICK FIELD
SPECIALISTS ON FIRE BRICKS NATAGARH
P. O. DIGRAH
Dist. HOOGHLY
Phone : 2702 2739